নানা সুতোর নকশা

নানা সুতোর নকশা

মডার্ন কলাম

১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই বিডন রো, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ বিজন ভট্টাচার্য

নানা সুতোর নকশা

নীলচে কাচ দিয়ে ঘেরা 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস'-এর এই লম্বা কামরাটার একদিকে দেওয়াল ঘেঁষে পর পর সাতটা কম্পিউটার। প্রতিটি মেশিনের সামনে একজন করে তরুণ বা তরুণী। তারা খুব মগ্ন হয়ে কম্পোজ করে চলেছে।

একেবারে কোণের দিকে বসেছে সুতপা। তার কম্পিউটারের পাশে থাক-দেওয়া বাংলা পাণ্ডুলিপি। কপি মিলিয়ে মিলিয়ে অক্ষর লাগানো বোতাম টিপে যাচ্ছে সে। সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনে লাইনের পর লাইন ফুটে উঠছে। কম্পোজের কাজে সে এমনই রপ্ত যে হারমোনিয়ামের রিডে ঝড় তোলার মতো দুরন্ত গতিতে তার আঙুল চলতে থাকে।

সুতপার বয়স আটাশ-উনত্রিশ। শ্যামবর্ণ হলেও বেশি সুশ্রী। এই বয়সে বাঙালি মেয়েদের চেহারায় সূক্ষ্ম ভাঙন ধরে। চোরা বানের মতো শরীরে ক্ষয় শুরু হয়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে সুতপার তেমন কোনও লক্ষণ চোখে পড়ে না। স্বাস্থ্য এখনও অটুট। তার ত্বকে নতুন পাতার মতো টাটকা লাবণ্য। ঘন চুল কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা। বড় বড় কালো চোখ দু'টিতে শান্ত, গভীর দৃষ্টি। পরনে রঙিন সালোয়ার কামিজ। তবে সেগুলোর রং ক্যাটকেটে চড়া নয়। চোখজুড়ানো। কপালে গোলাকার রঙিন টিপ। বাঁ হাতে চামড়ার ব্যান্ডে চৌকো ঘড়ি। গলায় ছোট লকেটওলা সরু সোনার চেন। গয়না টয়না বলতে এটুকুই। খুঁটিয়ে লক্ষ করলে দেখা যাবে, তার ভরাট, মসৃণ মুখে কোথায় যেন চাপা রুক্ষতা রয়েছে। নাকি কঠোরতা? তবে এটুকু আন্দাজ করা যায়, এ মেয়ের সামনে বেচাল করলে পার পাওয়া যাবে না।

কামরার আরেক দিকে বসে আছেন প্রদোষ লাহিড়ী। 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস'-এর মালিক। গোলগাল, ভারী চেহারা। চওড়া কপাল। কাঁচাপাকা চুল পাতলা হয়ে এসেছে। মাঝারি হাইট। চোখে ভারী ফ্রেমের চশমা। দেখামাত্র টের পাওয়া যায়, আমুদে মানুষ। সাজসজ্জার দিকে নজর নেই। পরনে ঢলঢলে শার্ট আর ট্রাউজার্স। শার্টটার দু'টো বোতাম নেই। গেঞ্জি পরতে খুব সম্ভব ভুলে গেছেন। বুকের অনেকটা অংশ তাই হাট করে খোলা।

প্রদোষের সামনে মস্ত টেবলের ওপর প্রচুর ফাইল, নানা ধরনের কাগজপত্র। আর রয়েছে তিনটে ফোন, তার একটা মোবাইল। টেবলের ওধারে খানচারেক চেয়ার। নানা কাজে যারা আসে, ওগুলো তাদের বসার জন্য।

প্রদোষের টেবলের পর এ ঘরের চওড়া কাচের পাল্লার দরজা। তারপর ট্রেসিং করার এক জোড়া মেশিন।

এখন মে মাসের মাঝামাঝি। শহরের তাপাঙ্ক বাড়ছে হু হু করে। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ। কী খাই কী খাই করতে করতে তপ্ত বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ছে দিগ্বিদিকে।

ঘরখানা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। শীতল এবং আরামদায়ক। তিনটে এয়ার-কুলার বাইরের সব দাহ রুখে দিচ্ছে।

সুতপার এক চোখ ডি টি পি মেশিনের স্ক্রিনে, আরেক চোখ পাণ্ডুলিপির কপির দিকে। তারই মধ্যে আবছাভাবে মনে হল, প্রদোষের টেবলে টেলিফোন বাজছে। এখানে মুহুর্মুহু ফোন আসে। দু-চার মিনিট পর পর কুরুর কুরুর আওয়াজ। কথাবার্তা বলে একটা নামাতে না নামাতে আরেকটা বেজে ওঠে। কখনও একসঙ্গে তিনটে। 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস' নাম-করা বড় বড় প্রকাশকদের কাজ করে। কম্পোজ করা থেকে বই ছাপা পর্যন্ত সমস্ত কিছু। প্রুফের জন্য তারা নিয়মিত তাগাদা দেয়, ছাপার কাজ কতদূর হল তার খোঁজ নেয়, কিংবা নতুন নতুন ম্যানাসক্রিপ্ট নিয়ে আসতে বলে।

সুতপা মেশিনে আঙুল চালাতে চালাতে টের পেল, টেলিফোন তুলে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন প্রদোষ। একটু পরেই তাঁর ডাক শোনা গেল, 'সুতপা এদিকে এসো। তোমার ফোন।'

সুতপা রীতিমতো অবাক হল। 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিক্স'-এ বছর তিনেক কাজ করছে সে। এর ভেতর একমাত্র দীপঙ্কর ছাড়া আর কেউ কখনও ফোন করে নি। তাও ক্বচিৎ কখনও। খুব জরুরি কোনও ব্যাপার না হলে কেউ কাজের জায়গায় টেলিফোনে খোশগল্প করে সময় নষ্ট করুক, এটা তার আদৌ পছন্দ নয়। দীপঙ্করও তা জানে। তা ছাড়া, আজ সকালেই 'লাহিড়ীস লেজারগ্রাফিকস'-এ আসার আগে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে। দীপঙ্করের ইচ্ছা, 'প্রিয়া' সিনেমায় একটা দারুণ বিদেশি ছবি এসেছে। আজ ইভিনিং শো'য়ে সুতপা আর সে একসঙ্গে বসে সেটা দেখে। একেবারে টিকেট কেটে নিয়ে এসেছিল। তার একটা সুতপাকে দিয়ে বলেছিল, ডিউটি শেষ হলে এক সেকেন্ডও যেন সুতপা দেরি না করে। সাড়ে পাঁচটায় শো। তার আগে আগেই যেন হল-এ পৌঁছে যায়। দীপঙ্কর সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করবে।

সুতপার অনেকদিন সিনেমা থিয়েটার দেখা হয়নি। এখন টিকেটের যা চড়া দাম তাতে ওসব দেখার কথা ভাবাই যায় না। বিশেষ করে তার মতো মেয়েদের পক্ষে। চল্লিশ টাকা দিয়ে টিকেট কেটে দু-আড়াই ঘন্টার এয়ার-কন্ডিশানড হল-এ আরাম এবং বিনোদন কেনার চাইতে ওই দামে তিন কিলো চা কি আটা কিনলে তিন দিনের জন্য নিশ্চিন্ত। দীপঙ্করদের হালও তাদের চাইতে ভাল কিছু নয়। তবে কখনও কখনও দুম করে দু-এক শ' টাকা ওড়াবার মতো হঠকারিতা সে করে বসে।

সিনেমা দেখার ইচ্ছে সুতপার যে ছিল না তা নয়। তবু এতগুলো টাকা খরচ করে বসার জন্য দীপঙ্করকে একটু বকাঝকাও করেছিল। সেই সঙ্গে ছোট্ট একটা

শর্তও জুড়ে দিয়েছিল, 'ছবিতে খারাপ খারাপ সিন থাকলে আমি কিন্তু তক্ষুনি হল থেকে বেরিয়ে আসব।'

চোখ নাচিয়ে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে দীপঙ্কর বলেছিল, 'ইংরেজি ছবি দেখবে আর তাতে চুমু থাকবে না, হিরো-হিরোইনের জড়াজড়ি মানে আলিঙ্গন থাকবে না, গরম বেড-রুম দৃশ্য থাকবে না, তাই কখনও হয়! একেবারে বড় পিসিমাদের মতো শুচিবাই।'

চোখ পাকিয়ে তাকিয়েছিল সুতপা।

দীপঙ্কর থামে নি, 'আমাদের তো এখনও বিয়ে হয় নি। বিয়ের পর কী কী করতে হয়, তার একটা লেসন নেওয়া দরকার। ইংলিশ পিকচারগুলো আন-ম্যারেড আনাড়িদের দারুণ ট্রেনিং দিয়ে দেয়।'

মুখ লাল হয়ে উঠেছিল সুতপার, 'আমি এই অসভ্য ছবি দেখতে যাব না। এই নাও তোমার টিকেট—'

টিকেট ফিরিয়ে নেয় নি দীপঙ্কর। সুতপার গালে আলতো টোকা দিয়ে বলছে, 'আরে বাবা, ওই ছবিটায় সেক্স ফেক্স কিস্‌সু নেই। স্রেফ টিন-এজ লাভ স্টোরি। নায়ক নায়িকা তিন ফিট দূরে দাঁড়িয়ে প্রেম করছে। হল তো?'

সন্দেহ পুরোপুরি কাটে নি সুতপার। যা শয়তান ছেলে, কিছুই বিশ্বাস নেই। ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেছে সে। তবে এই ব্যাপারটা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করেনি। যার সঙ্গে কয়েক ঘন্টা আগে দেখা, হঠাৎ সে কেন ফোন করে বসল, বোঝা যাচ্ছে না। মেশিন অফ করে প্রদোষের টেবলের সামনে এসে দাঁড়াল সুতপা। জিজ্ঞেস করল, 'কে ফোন করেছে প্রদোষদা?' বলেই মনে মনে জিভ কাটল। প্রশ্নটা বোকার মতো হয়ে গেছে। দীপঙ্কর ছাড়া আর কে-ই বা ফোন করতে পারে?

একটা ভুরু উঁচুতে তুলে মজার একটা ভঙ্গি করল প্রদোষ, 'নাম বলেনি। মনে হচ্ছে, তোমার বয় ফ্রেন্ড—'

দীপঙ্করই তার এক বন্ধুর মারফত প্রদোষের সঙ্গে যোগাযোগ করে 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস'-এ সুতপার এই কাজটার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তাদের দু'জনের সম্পর্কটা ভাল করেই জানে প্রদোষ।

একটা ফোন টেবলের ওপর নামানো ছিল, নতচোখে সেটা তুলে নিয়ে হ্যালো বলতেই ওধার থেকে বাবার গলা ভেসে এল, 'কে, খুকু?'

সুতপা চমকে উঠল। তিন বছরে তার বাবা কৃষ্ণকিশোর দত্ত কখনও এখানে ফোন করেন নি। সিনেমা দেখে ন'টার মধ্যেই তো সে বাড়ি পৌঁছে যেত। সিনেমার কথা অবশ্য সে মা বাবা ছোটদি কি ছোট ভাই নিপু, কাউকেই জানায় নি। শুধু বলেছিল, আজ ফিরতে দু-তিন ঘন্টা দেরি হবে। বাড়ির সবাই জানে, কাজের চাপ থাকলে অনেক সময় ওভার টাইম করতে হয়। কেউ কোনও প্রশ্ন করে নি। ওভার

টাইমের ব্যাপারটা সবার জানা। কিন্তু কী এমন ঘটতে পারে যাতে ফোন না করে বাবার উপায় ছিল না? মায়ের শরীর কি হঠাৎ খুব খারাপ হয়েছে? তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ক'বছর ধরে কী উৎকণ্ঠাই না চলছে। এই যায় যায়। দু-পাঁচ দিন পর ফের সামলে ওঠে। কখন কী যে ঘটে বসবে, আগে থেকে আঁচ পাওয়া মুশকিল।

দীপঙ্করের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবে। ফুরফুরে লঘু মেজাজেই ছিল সুতপা। আচমকা পাষাণভারের মতো দুশ্চিন্তা তার মাথায় চেপে বসে। শুকনো গলায় সাড়া দেয়, 'হ্যাঁ, বাবা।' কৃষ্ণকিশোরকে বলার সুযোগ না দিয়ে এক নিশ্বাসে বলে যায়, 'মায়ের কি কিছু হল? বেরোবার সময় দেখে এসেছিলাম, হাঁপানির টান উঠেছে। সে তো রোজই ওঠে।'

কষ্ণকিশোর তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুই বেরিয়েছিস বাড়ি থেকে সোয়া আটটায়। আমি এগারোটায়। তখন তোর মায়ের টানটা ছিল না।'

যাক, মায়ের ব্যাপারে মানসিক চাপটা কাটল। তবু ফোনের কারণটা না জানা পর্যন্ত চিন্তার উপশম হবার সম্ভাবনা নেই।

কৃষ্ণকিশোর এবার বললেন, 'তোর ডিউটিটা তো পাঁচটায় শেষ?'

'হ্যাঁ।'

'আজ ওভার টাইম আছে?'

'না।'

'ভালই হল। ছুটির পর গড়িয়াহাট মার্কেটে, রাস্তার ঠিক ওপরে টিভি, ফ্রিজ ওয়াশিং মেশিনের যে বিরাট শো-রুমটা আছে, সোজা সেখানে চলে আসবি। আমি তোর জন্যে ওখানে ওয়েট করব। সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে পাতাল রেল ধরলে কালিঘাট স্টেশনে নেমে অটো কি বাস টাস ধরলে ছ'টা সোয়া ছ'টায় পৌঁছে যাবি। দেরি করিস না কিন্তু—'

সুতপা হতভম্ব। তাদের বাড়িতে সারাক্ষণ সংকট লেগেই আছে। কিন্তু খানিকটা লঘু সুরে যেভাবে কৃষ্ণকিশোর কথা বলছেন তাতে মনে হয় না পৃথিবীতে কোথাও কোনও সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে তাদের পরিবারে। কলকাতা শহরে এত এত জায়গা থাকতে গড়িয়াহাট মার্কেটের সামনে কেন তিনি দেখা করতে বলছেন, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। সবটাই ধাঁধার মতো। সুতপাদের বাড়ি চেতলায় নরেশ আড্ডি রোডে। আর 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস' উত্তর কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রিটে। রোজই কালিঘাট স্টেশন দিয়ে তাকে যাতায়াত করতে হয়। বাবা তাকে সরাসরি বাড়িতেই তো চলে যাবার কথা বলতে পারতেন।

সুতপার বিস্ময় বাড়ছিলই। কৌতূহলও। সে জিজ্ঞেস করল, 'গাড়িয়াহাটে যেতে বলছ কেন?'

কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'দরকার আছে।' বলেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'আমি একটা

পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে কথা বলছি। অনেক লোক পেছনে ওয়েট করছে। এখন রাখছি। দেখা হলে সব বলব।'

ফোন নামিয়ে রেখে সুতপা কয়েক পলক দাঁড়িয়ে রইল। সমস্ত কর্মসূচি তার গোলমাল হয়ে গেছে। বাবার সঙ্গে ছ'টা নাগাদ গাড়িয়াহাটে দেখা করতে হবে। তার মানে আজকের সিনেমা দেখাটা বাতিল।

দীপঙ্করকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেওয়া দরকার। নইলে চাতক পাখির মতো 'প্রিয়া' সিনেমার সামনে সে দাঁড়িয়ে থাকবে।

দীপঙ্কর একটা অ্যাড এজেন্সি, অর্থাৎ বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করে। পার্মানেন্ট কিছু নয়, ফুরনের কাজ। কিছু অনুবাদ করতে হয়। এজেন্সির ক্লায়েন্ট আছে। এদের কেউ গেঞ্জি, জাঙিয়া, মেয়ের প্যান্টি ব্রা এবং অন্যান্য অন্তর্বাস তৈরি করে। কেউ বানায় বহু ধরনের কসমেটিকস—স্নো, ক্রিম, বডি-পাউডার ইত্যাদি। কেউ বা আচার, বিস্কুট, পাঁউরুটি, কুচো নিমকি, চানাচুর জাতীয় মুখরোচক নানা জিনিস। এই সব প্রোডাক্ট যাতে বাজারে ভাল বিকোয় সে জন্য লাগসই স্লোগান লিখতে হয় দীপঙ্করকে। খবরের কাগজ বা টিভিতে প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনের কপি লিখতে হয়। কাজ অনুযায়ী মাসের শেষে হিসেব কষে বিল দিলে মজুরি মেলে।

দীপঙ্করদের কোম্পানি 'ড্রিমল্যান্ড অ্যাডভারটাইজিং'-এর অফিসটা কোথায়, মোটামুটি ধারণা আছে সুতপার। লিন্ডসে স্ট্রিটে 'গ্লোব' সিনেমার পাশের গলিতে। ইংরেজ আমলের একটা পুরনো বাড়ির দোতলায়। দীপঙ্কর বলেছিল, গেটের কাছে তাদের এজেন্সির বড় সাইন বোর্ড আছে। ওখানকার ফোন নাম্বারও দিয়েছিল। কিন্তু কোনও দিন যাওয়া বা ফোন করা হয়ে ওঠেনি।

দু'টোর পর দীপঙ্করকে ওদের অফিসে পাওয়া যায়। চট করে সামনের দেওয়ালের ওয়ালক্লকটা একবার দেখে নিল সুতপা। তিনটে বাজতে দশ মিনিট বাকি। ভাবল, ফোন করে ওকে জানিয়ে দেবে আজ সিনেমায় যাওয়া হচ্ছে না। পরক্ষণেই খেয়াল হল, ওদের নাম্বারটা মনে নেই। বাড়িতে একটা ডায়েরিতে লেখা আছে। অবশ্য টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে সেটা বার করে নেওয়া যায়।

লহমায় সিদ্ধান্তটা নাকচ করে দিল সুতপা। খুব আশা করে আছে দীপঙ্কর, কয়েকটা ঘন্টা তাকে কাছাকাছি পাবে। হঠাৎ ফোন করে দু-চার কথায় সিনেমার প্রোগ্রামটা খারিজ করে দিলে তার ক্ষোভ শতগুণ বেড়ে যাবে। তার চেয়ে ওর অফিসে গিয়ে সব খুলে বললে নিশ্চয়ই বুঝবে, সুতপা কতটা নিরুপায়। কেন তার পক্ষে আজ সিনেমা দেখা সম্ভব নয়।

প্রদোষ পলকহীন তাকিয়ে ছিলেন। বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাঁকে। খানিক আগের সেই হালকা ফাজলামো করার মেজাজটা আর নেই। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার

বাবা ফোন করেছিলেন কি?' সুতপাদের কথাবার্তা শুনে সেটা অনুমান করে নিয়েছিলেন তিনি।

সুতপা আস্তে মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ।'

'এনি প্রবলেম?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। বাবা রাস্তায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমাকে সেখানে দেখা করতে বললেন। প্রদোষদা, আজ ফুল টাইম ডিউটি দিতে পারছি না। আপনি পারমিশন দিলে এক্ষুনি যেতে চাই।'

প্রদোষ বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি চলে যাও। যদি কোনও দরকার হয়, আমাকে জানিও।' কৃষ্ণকিশোর হঠাৎ ফোন করায় তিনি যে বিচলিত হয়েছেন তা বোঝা যায়।

'জানাবো—'

সুতপা যে পাণ্ডুলিপি থেকে কম্পোজ করছিল সেটা যত্ন করে তার টেবলের ড্রয়ারে 'লক' করে রেখে চাবিটা প্রদোষকে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

দুই

পাতাল রেলে এসপ্ল্যানেডে এসে কয়েক মিনিট হেঁটে লিন্ডসে স্ট্রিটে চলে এল সুতপা। সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। রোদের গনগনে চেহারাটা প্রায় দুপুর বেলার মতোই রয়েছে। রাস্তার পিচ গলে কাদার মতো তলতলে। পা ফেললে জুতো আটকে যায়।

ডান দিকের ফুটপাথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল সুতপা। লাইন দিয়ে কত যে শো-রুম। কোনওটা ঘড়ির, কোনওটা জুতোর, কোনওটা গয়নার, কোনওটা রেডিমেড গারমেন্টস বা এক্সক্লুসিভ শাড়ির। উলটো দিকে নিউ মার্কেট। সেখানেও সারিবদ্ধ দোকান, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স। মাঝখানে মস্ত একটা চত্বরে কার পার্কিং-এর ব্যবস্থা। অ্যামবাসাডার, মারুতি-এসটিম, টাটা সুমো, ফিয়েট থেকে কী নেই সেখানে!

প্রতিটি শো-রুমে উপচে-পড়া ভিড়। পুরুষের চেয়ে মহিলাই বেশি। রাস্তাতেও প্রচুর লোকজন। তপ্ত বাতাস, রোদের হলকা, কিছুই তারা গ্রাহ্য করছে না।

'গ্লোব' সিনেমার পাশের গলিতে ঢুকে দীপঙ্করদের অফিসটা খুঁজে বার করতে অসুবিধা হল না সুতপার। ব্রিটিশ আমলের জমকালো চারতলা বিল্ডিং। বাড়িটার যে রীতিমতো যত্ন নেওয়া হয় তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। খুব সম্প্রতি রং টং করা হয়েছে। দরজা জানালা থেকে টাটকা পেইন্টের গন্ধ উঠে আসছে।

চকচকে বিরাট লোহার গেটের গায়ে কাঠের বোর্ডে অনেকগুলো কোম্পানির নাম এবং কোনটা কোন ফ্লোরে, সব লেখা আছে।

দীপঙ্কর বলে দিয়েছিল, তবু একবার মিলিয়ে নিল সুতপা।

গেটের পর অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে দু'ধারে সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখান দিয়ে বাঁধানো রাস্তা মেইন বিল্ডিংয়ের দিকে চলে গেছে।

চারতলা হলেও বাড়িটা ছ'তলার মতো উঁচু। ফ্লোরগুলোর উচ্চতা কম করে কুড়ি বাইশ ফিট। ভেতরে গিয়ে সুতপা দেখল, একধারে সেকেলে ধাঁচের প্রকাণ্ড লিফট। সেটার পাশ দিয়ে জুটের কার্পেট-বসানো চওড়া কাঠের সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। সিঁড়ির পিলার ঘেঁষে তামার পাত লাগানো কাঠের রেলিং। কলকাতা স্বাধীনতার পর পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছরে কত পালটে গেছে। বাড়িঘর, স্থাপত্য, যানবাহন, সমস্ত কিছু। কিন্তু এই বাড়িটা যেন ব্রিটিশ আমলের যাবতীয় মহিমা অবিকল ধরে রেখেছে।

লিফটের দিকে না গিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে দোতলায় উঠে এল সুতপা। এখানে প্রশস্ত প্যাসেজের দু'ধারে পর পর অফিস। প্রত্যেকটার মাথায় বা পাশের দেওয়ালে সাইন বোর্ড। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই 'ড্রিমল্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং'-এর অফিসটা পাওয়া গেল।

সারাটা পথ রোদের অসহ্য তাতে পুড়তে পুড়তে এসেছে সুতপা। কাচের মস্ত দরজা ঠেলে ভেতরে পা দিতেই সারা শরীর জুড়িয়ে গেল। তাদের 'লাহিড়ী লেজারগ্রাফিকস'-এর মতো এই অফিসটাও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত।

একধারে 'রিসেপশান'। সেখানে একটি ঝকঝকে তরুণী বসে ছিল। তার সামনের গ্লাস-টপ টেবলে দু'টো রঙিন টেলিফোন। ফাইল। প্যাড।

রিসেপশানিস্ট মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ইংরেজিতে সে বলল, 'বলুন আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

সুতপা ইংরেজিতেই বলল, 'আমি দীপঙ্কর ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে চাই—'

'রিসেপশান'-এর একধারে বাইরের লোকজনদের জন্য বসার ব্যবস্থা। সোফা, সেন্টার টেবিল ইত্যাদি দিয়ে চমৎকার সাজানো। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে তরুণীটি বলল, 'আপনি কাইন্ডলি ওখানে একটু ওয়েট করুন।' বলে ফোন তুলে ডায়াল করতে লাগল।

সুতপা গিয়ে সোফায় বসল। টেলিফোনে কথা বলে সেটা নামিয়ে রাখতে রাখতে রিসেপশানিস্ট তাকে জানালো, 'মিস্টার ঘোষ আসছেন—'

দু' মিনিটও অপেক্ষা করতে হল না। অফিসের ভেতর থেকে 'রিসেপশান'-এ চলে এল দীপঙ্কর। সুতপাকে দেখে কয়েক পলক থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বলে, 'তুমি!'

দীপঙ্করের বয়স বত্রিশ তেত্রিশ। ধারাল, ছিপছিপে চেহারা। ছ'ফিটের কাছাকাছি হাইট। চুল ব্যাক-ব্রাশ করা। চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ। পরনে ট্রাউজার্স আর বুশ শার্ট।

সুতপা একটু হাসল, 'হ্যাঁ।'

বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি দীপঙ্করের। আগে থেকে সময় ঠিক করে আজ সকালে কালীঘাট স্টেশনে তারা দেখা করেছিল। সেখানে সুতপাকে সিনেমার টিকেট দিয়েছে সে। কিন্তু তখন ঘুণাক্ষরেও সুতপা আভাস দেয় নি, কয়েক ঘন্টা পর সে তার অফিসে এসে হাজির হবে।

দীপঙ্কর বলল, 'তোমার সঙ্গে তো সন্ধেবেলায় সিনেমা হলে দেখা হবার কথা। হঠাৎ এমন কী ঘটল যে এখানে চলে আসতে হয়েছে!'

সুতপা বলল, 'তোমার সঙ্গে খুব আর্জেন্ট কথা আছে—'

'বল—' সুতপার দিকে চোখ রেখে ধীরে ধীরে একটা সোফায় বসে পড়ে দীপঙ্কর।

ইশারায় রিসেপশানিস্ট মেয়েটিকে দেখিয়ে সুতপা নিচু গলায় বলল, 'ও কাছে বসে আছে। এখানে বলা কি ঠিক হবে?'

'মিস সোন্ধি নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের দিকে তাকাবেও না। শুরু কর—'

যার পদবি সোন্ধি, সে নিশ্চয়ই অবাঙালি। ভাল করে মেয়েটিকে দেখে নিয়ে সুতপা দীপঙ্করের দিকে চোখ ফেরায়, 'আগে বল, তুমি রাগ করবে না—'

সুতপার আসাটা এমনই আকস্মিক আর অভাবনীয় যে প্রথমটা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। সেই ভাবটা এখন কাটিয়ে উঠেছে। বলল, 'রাগ করার মতো কিছু বলবে নাকি?'

প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। সুতপা তারপর কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'আজ আমি সিনেমায় যেতে পারছি না।

ভুরু কুঁচকে গেল দীপঙ্করের। ঝাঁঝাল সুরে সে বলে, 'জানো ওই ফিল্মটার কী সাঙ্ঘাতিক ডিমান্ড! কত কষ্ট করে দু'টো টিকেট যোগাড় করেছি! আর লাস্ট মোমেন্টে তুমি বলছ কিনা, দেখতে যাবে না। এর কোনও মানে হয়? ভেবেছিলাম সন্ধেটা একসঙ্গে কাটাব। সব বারোটা বেজে গেল।' তার ভেতর থেকে ক্ষোভ, আশাভঙ্গের কষ্ট ঠিকরে বেরিয়ে আসতে থাকে।

এই মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই সুতপার। দীপঙ্কর পাশে না দাঁড়ালে তাদের ফ্যামিলির দুর্গতির শেষ থাকত না। কিন্তু সে সব কথা পরে।

মুখটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল সুতপার। নতচোখে সে বলল, 'খানিকক্ষণ আগে বাবা ফোন করে ছ'টা নাগাদ এক জায়গায় দেখা করতে বলল। এই অবস্থায় কী করে সিনেমায় যাই?'

দীপঙ্কর চকিত হয়ে ওঠে, 'হঠাৎ দেখা করতে বললেন? কোনও সমস্যা হয়েছে?'

ঠিক এই প্রশ্নটা 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস'-এর মালিক প্রদোষ লাহিড়ীও করেছিলেন। একই উত্তর দিল সুতপা, 'কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

একটু আগের বিরক্তি বা অসন্তোষ, কিছুই আর নেই দীপঙ্করের। তাকে রীতিমতো চিন্তিত দেখাচ্ছে। বলল, 'ঠিক আছে, সিনেমায় যেতে হবে না। টিকেট দু'টো বিক্রি করে দেব। পরে একদিন দেখা যাবে।'

যদিও সমস্ত ব্যাপারটায় তার কোনও হাত নেই, তবু নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে সুতপার। সে চুপ করে থাকে।

দীপঙ্কর বলে, 'আমি কি তোমার সঙ্গে যাব? যদি তেমন কোনও—' হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, 'না না, আমার যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

দীপঙ্কর যে 'লাহিড়ীস লেজারগ্রাফিকস'-এ সুতপাকে কাজটা পাইয়ে দিয়ে তাঁদের অশেষ উপকার করেছে, কৃষ্ণকিশোরের তা অজানা নেই। কিন্তু হিমশৈলের ওপরের দিকটাই হয়ত তাঁর চোখে পড়েছে। ভেতরে ভেতরে সুতপার সঙ্গে দীপঙ্করের সম্পর্কটা কতদূর পর্যন্ত শেকড় বাকড় ছড়িয়ে দিয়েছে সেটা নিশ্চয়ই তাঁর জানা নেই। একবারই মাত্র দীপঙ্কর সুতপাদের বাড়ি গিয়েছিল। তাও তিন বছর আগে। 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস'-এ তার চাকরি হয়েছে, এই সুখবরটা দেবার জন্য। দু'জনেই ঠিক করে রেখেছে, রোজগার টোজগার ভদ্র রকমের হলে বাড়িতে জানাবে, তারা বিয়ে করতে চায়। অবশ্য তেমন আলোর সংকেত এখনও চোখের সামনে নেই।

হুট করে সুতপার সঙ্গে দীপঙ্কর গেলে কৃষ্ণকিশোর অবাক হবেন। হয় বিরক্তও। সুতপার সঙ্গে তার যে গোপন মেলামেশা আছে, সেটা ধরা পড়ে যাবে। সমস্ত পরিস্থিতিটা হয়ে উঠবে ভীষণ অস্বস্তিকর। তাই না যাওয়াই ভাল।

দীপঙ্কর বলল, 'কী জন্যে তোমার বাবা তোমাকে দেখা করতে বলেছেন, আমাকে রাত্তিরে ফোন করে জানিও। নইলে ঘুমোতে পারব না।'

দীপঙ্করের টেলিফোন নেই। ওদের পাশের বাড়ির অনুকূল ধরদের ফোন নাম্বারটা সে সুতপাকে দিয়ে রেখেছে। অনুকূলবাবুরা মানুষ ভাল। ওঁদের ওখানে ফোন করলে তক্ষুনি কাউকে না কাউকে পাঠিয়ে দীপঙ্করকে ডেকে নিয়ে আসে। খুব জরুরি কারণ না থাকলে পারতপক্ষে অনুকূলদের বিরক্ত করে না সুতপা। সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কখন বাড়ি ফিরবে?'

দীপঙ্কর বলল, 'সিনেমা যখন দেখা হচ্ছে না তখন বেশি দেরি করব না। অফিস থেকে বেরিয়ে 'প্রিয়া' সিনেমায় গিয়ে টিকেট দু'টো বেচে বাড়ি চলে যাব। ফর নাথিং গরিবের টাকাটা নষ্ট হয় কেন? তোমার টিকেট তো সঙ্গেই আছে?'

'হ্যাঁ—'

'ওটা দাও।'

ব্যাগ থেকে টিকেট বার করে দীপঙ্করকে দিতে দিতে সুতপা বলল, 'আটটায় তোমাকে ফোন করব।'

'ঠিক আছে।'

'তুমি নিশ্চয়ই কাজ করছিলে। আর আটকে রাখব না। উঠলাম—'

ঘড়ি দেখে দীপঙ্কর বলে, 'সবে চারটে বেজে দশ। রোদে রোদে কোথায় ঘুরবে? সন্ধেবেলায় তো বাবার সঙ্গে দেখা করার কথা। মাঝখানের দু'টো ঘন্টা বরং এই ঠাণ্ডা ঘরে পাঁচটা পর্যন্ত ওয়েট কর। হাতের কাজটা শেষ করে পাঁচটায় তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। কালীঘাট স্টেশনে নেমে অটো ধরে আমি 'প্রিয়া' সিনেমায় নেমে যাব। তুমি গড়িয়াহাট চলে যেও।'

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অফিসের শীতলে আরামে সময় কাটাতে ভালই লাগবে কিন্তু রিসেপশানিস্ট মেয়েটির সামনে বসে থাকার কথা ভাবতেই কেমন যেন সিঁটিয়ে গেল সুতপা। মেয়েটি হয়ত কিছুই বলবে না, নির্বিকার মুখে ডিউটি করে যাবে। কিন্তু সে কি টের পায় নি তার সঙ্গে দীপঙ্করের সম্পর্কটা কী ধরনের? প্রতীক্ষারত সুতপার দিকে তাকিয়ে সে কি আর মনে মনে আমোদ বোধ করবে না?

সুতপা বলল, 'না না, আমি এখানে বসে থাকতে পারব না।' সে লাজুক ধরনের মেয়ে। নম্র এবং শান্ত। 'আমি আমার প্রিয় পুরুষটির জন্য অপেক্ষা করছি, বেশ করছি'—এ জাতীয় বেপরোয়া ভাব তার মধ্যে একেবারেই নেই।

চকিতে একবার রিসেপশানিস্ট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা আঁচ করে দীপঙ্কর। তারপর বলল, 'বুঝেছি। চল—'

বাইরের প্যাসেজে এসে দীপঙ্কর চাপা গলায় বলল, 'আজকালকার কচি কচি লাভাররা, যাদের এখনও শিং গজায় নি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে কিস খাচ্ছে। আর কে কী মনে করবে তাই ভেবে তুমি পালিয়ে যাচ্ছ! চল্লিশ বছর আগে তোমার বঙ্গদেশে জন্মানো উচিত ছিল।'

কপাল কুঁচকে সুতপা জোরে ধমক লাগায়, 'একদম বাজে ইয়ারকি করবে না।'

হাতজোড় করে করুণ মুখে দীপঙ্কর বলল, 'ক্ষমা ম্যাডাম, ক্ষমা—'

'ক্লাউন কোথাকার—'

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠেছিল সুতপা। দীপঙ্কর তাকে লিফটে করে নিচে নামিয়ে আনল। বলল, 'ফোনের কথা ভুলে যেও না কিন্তু। আমি খুব আংশাসলি ওয়েট করব।' এখন আর চোখেমুখে কণ্ঠস্বরে মজাদার ব্যাপারটা নেই।

আচমকা সুতপার মনে হল, দীপঙ্করের স্বভাবের সঙ্গে কোথায় যেন প্রদোষের খানিকটা মিল রয়েছে। জীবনটা খুব সম্ভব লঘু চালে কাটিয়ে দিতে ভালবাসে। তবে সমস্যা দেখা দিলে পুরোপুরি বদলে যায়। তখন তারা ভীষণ সিরিয়াস।

নিউ মার্কেট এলাকার অগুনতি শো-রুমের রকমারি জিনিস দামি দামি ঘড়ি, লেডিজ গারমেন্টস, শাড়ি, কসমেটিকস দেখে দেখে খানিকটা সময়ে কাটাল সুতপা। তারপর উদ্দেশ্যহীনের মতো আরও কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে সোয়া পাঁচটায় পাতাল রেল ধরল।

কালীঘাট স্টেশনে নেমে তক্ষুনি অটো পাওয়া গেল না। কী গণ্ডোগোল হয়েছে, এই রুটে আপাতত অটো চলাচল বন্ধ। আর মিনিবাসগুলোতে ঠাসা ভিড়, পা-দানিতে মানুষ ঝুলছে। ভেতরে মাছি গলবার মতো ফাঁক নেই। অফিসপাড়ায় ছুটি হয়ে গেছে। সেখান থেকে গাড়িগুলো বোঝাই হয়ে আসছে। বাস বা মিনিবাসে ওঠা অসম্ভব। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা ট্রাম পাওয়া গেল। এটাতেও বেশ ভিড়। তবে দাঁড়াবার মতো জায়গা আছে।

গড়িয়াহাটে নেমে ট্রাম লাইন পেরোতে পেরোতে সুতপার চোখে পড়ল, টিভি ফ্রিজের জমকালো শো-রুমটার সামনে কৃষ্ণকিশোর দাঁড়িয়ে আছেন। বড় বড় পা ফেলে তাঁর কাছে চলে এল সে।

কৃষ্ণকিশোরের বয়স সত্তর ছুঁই ছুঁই। ভাঙাচোরা, কৃশ চেহারা। মাথায় পাঁশুটে রঙের পাতলা চুল। গাল বসে গেছে। থুতনির হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। রোগা হাতের শিরগুলো পাকানো দড়ির মতো। কপালে অজস্র বলিরেখা।

তাঁর পরনে বাড়িতে কাচা, বাড়িতেই ইস্তিরি-করা ধুতি আর হাতা-গুটনো লং ক্লথের পাঞ্জাবি। পায়ে সস্তা চপ্পল। চোখে গোল ফ্রেমের চশমা।

দেখামাত্র টের পাওয়া যায়, লোকটার ওপর দিয়ে প্রচুর ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে।

মেয়েকে দেখে একমুখ হাসলেন কৃষ্ণকিশোর। তাঁর দু'পাটির আট দশটা দাঁত নেই। পয়সার অভাবে বাঁধানো যায় নি। বললেন, 'খুব ঘাবড়ে গেছিস, না?'

সুতপা বলল, 'ঘাবড়াব না? আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না, এমন একটা জায়গায় কেন দেখা করতে বললে! কী চিন্তা যে হচ্ছে।'

'চিন্তার কারণ নেই। এখানে ছাড়া আর কোথাও তোর সঙ্গে দেখা করার কথা মাথায় আসে নি।'

'কেন?'

কৃষ্ণকিশোরের হাসিটা আরও ছড়িয়ে পড়ে। 'গড়িয়াহাট হল সাউথ ক্যালকাটার সব চেয়ে বড় মার্কেট। তোকে নিয়ে আজ মনের সুখে বাজার করব। কতদিন ভালমন্দ খাই নি। রোজই ভাত ডাল আলু-কুমড়োর ঘ্যাঁট কি ঢেঁড়শ চচ্চড়ি। রাত্তিরে শুকনো রুটি। জিভ একেবারে বোদা মেরে গেছে।'

বলে কি লোকটা! হতভম্ব সুতপা বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। আগে খেয়াল করে নি, এবার চোখে পড়ল তাঁর হাতে চটের বড় বড় নতুন দু'টো ব্যাগ।

মে মাসের সন্ধে ধীর চালে নেমে আসছিল। চারদিকে হালকা অন্ধকার। অবশ্য এর মধ্যে যেদিকে যতদূর চোখ যায় অজস্র আলো জ্বলে উঠেছে। কর্পোরেশনের আলো, সারি সারি শো-রুম আর দোকানের আলো। বাড়ি ঘরের আলো। উঁচু উঁচু হাই-রাইজের মাথায় রঙিন নিওন। গড়িয়াহাট রাতের স্বপ্নপুরী হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'আগে বালিগঞ্জ স্টেশনের দিকটায় যাই।'

বিহ্বল ভাবটা কাটে নি সুতপার। জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে কেন?'

'বারুইপুর থেকে চাষীরা এই সময়টা আনাজ টানাজ এনে ফুটপাথে বাজার বসায়। সব ফ্রেশ—'

ভিড় ঠেলে ঠেলে কৃষ্ণকিশোরের পিছু পিছু হাঁটতে লাগল সুতপা। বাবা সমানে বক বক করে যাচ্ছেন। খুব সম্ভব আজ বাড়িতে কী কী পদ রান্না হবে তার লম্বা ফিরিস্তি। কিন্তু কিছুই কানে ঢুকছিল না তার।

ফুটপাথের বাজারে পৌঁছে কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'কী বলছিলাম? দ্যাখ কেমন সব টাটকা সবজি। এটা ধর—' একটা ব্যাগ সুতপাকে দিয়ে বিপুল উৎসাহে ঘন সবুজ বড় বড় পটল, সোনালি কুমড়ো, ঝিঙে, বেগুন, আলু, পেঁয়াজ, কাঁকরোল থলে বোঝাই করে উপাদেয় সব সবজি নিজের হাতে বেছে বেছে কিনলেন। তারপর মেয়েকে নিয়ে সোজা গড়িয়াহাট মার্কেটের ভেতরে মাছের বাজারে চলে এলেন।

কৃষ্ণকিশোর জিজ্ঞেস করলেন, 'নারকেলের দুধ আর কাজুবাদাম বাটা দিয়ে চিংড়ির মালাইকারিটা খাসা হয়, কি বলিস?' মেয়ের জবাবের অপেক্ষা না করে বড় সাইজের তাজা বাগদা চিংড়ি কিনলেন সাত শ' গ্রাম। শুধু কি তাই, বিরাট কাতলার পেটি কিলোখানেক, সাত আট ইঞ্চি লম্বা পাতি ট্যাংরাও এক কিলো।

মাছের বাজার থেকে ফলের বাজার। তিন কিলো গাছপাকা হিমসাগর আম, মর্তমান কলা, কচি শশা, তরমুজ আর পুষ্ট লিচুও কিনে ফেললেন কৃষ্ণকিশোর। দু'টো ব্যাগ ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। মিষ্টি আর ফলের জন্য আরও একটা থলে কিনতে হল। নাম-করা মিষ্টির দোকান থেকে কিনলেন ক্ষীরের পানতুয়া আর কড়াপাকের সন্দেশ।

কেনাকাটা করতে করতে ঘেমে নেয়ে গেছেন কৃষ্ণকিশোর। জামা ভিজে গায়ে লেপটে গেছে। বললেন, 'এত জিনিসপত্র নিয়ে বাসে ওঠা যাবে না। ট্যাক্সিই নিতে হবে।'

ট্রামরাস্তায় এসে একটা ফাঁকা ট্যাক্সি ডেকে তিনটে ভারী ব্যাগ ডিকিতে ঢোকানো হল। তারপর সুতপাকে নিয়ে পেছনের সিটে উঠে বসলেন কৃষ্ণকিশোর। কোথায় যেতে হবে ট্যাক্সিওয়ালাকে জানিয়ে দিলেন।

ট্যাক্সি স্টার্ট দিয়ে চেতলার দিকে ছুটতে লাগল। এখন সাড়ে সাতটার মতো বাজে। আলোকোজ্জ্বল রাসবিহারী অ্যাভেনিউ ঝলমল করছে। রাস্তায় প্রচুর ভিড়। চারপাশ থেকে রকমারি যানবাহনের আওয়াজ আসছে। ট্রামের। বাসের। অটোর। মিনিবাসের। নানা ধরনের প্রাইভেট কারের। তা ছাড়া মানুষের কলরোল তো আছেই।

কোনও দিকে লক্ষ্য নেই সুতপার। বাবার কর্মকাণ্ড দেখতে দেখতে একেবারে বোবা হয়ে গেছে সে। তাদের বাড়িতে সপ্তায় তিনদিন বাজার হয়। বেলার দিকে গিয়ে বাবাই ঝড়তি পড়তি আলু, সরু সরু শুকনো ডাঁটা, কুমড়োর ফালি, কলমি কি নটে শাক কিনে আনেন। কদাচিৎ সাতদিনের বরফ-দেওয়া সস্তার কোনও মাছ। তিনিই কিনা আজ ম্যাজিশিয়ানের মতো ভেলকি দেখিয়ে দিচ্ছেন। মনে মনে এর মধ্যে হিসেব করে নিয়েছে সুতপা। সব মিলিয়ে পাঁচ ছ'শো টাকার মাছ আনাজ ফলটল কিনেছেন কৃষ্ণকিশোর। ওটা তাদের পুরো মাসের বাজার খরচ। তার ওপর ট্যাক্সি করে যাওয়া। সুতপার মনে হল, বাবার মাথাটা হঠাৎ কি খারাপ হয়ে গেল! নাকি আলাদিনের সেই আশ্চর্য প্রদীপটা পেয়ে গেছেন!

কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'কতদিন পর আজ ট্যাক্সি চড়লাম। আহ্—' তাঁর গলার ভেতর থেকে আরামসূচক শব্দ বেরিয়ে এল।

কৃষ্ণকিশোরের মুখে সুতপার চোখ আটকে আছে। সে বাবাকে দেখছেই। দেখছেই। আজ সকালে কাজে বেরোবার আগেও সে মানুষটাকে দেখে গেছে বিষাদগ্রস্ত, ম্রিয়মাণ, এখন আর তাঁকে চেনা যায় না। শুধু কি আজ সকালেই, ক'বছর ধরেই কৃষ্ণকিশোরের কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবার পর তাঁকে আদৌ স্বাভাবিক মনে হয় নি। কখনও ত্রস্ত। কখনও মোহ্যমান। কখনও বা খিটখিটে, রুক্ষ। দুশ্চিন্তায়, উৎকণ্ঠায় নুড়ে-পড়া একটা মানুষ। পুরো মানুষ নয়। ক্ষয়ে ক্ষয়ে, ভেঙেচুরে মানুষের একটা ভগ্নাংশ মাত্র। কোনও রকমে ধুঁকে ধুঁকে টিকে ছিলেন। কিন্তু সকাল থেকে এই সন্ধে, এই ক'ঘন্টার ভেতর কী এমন ঘটল, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এখন পুরোপুরি চাপমুক্ত। মেজাজ ফুরফুরে। মনেই হয় না, তাঁর ধারে কাছে কোথাও কখনও কোনও সংকট ছিল। এমন ভোজবাজিটা ঘটল কী করে? আচমকা কি জাদুকাঠির ছোঁয়া লেগেছে বাবার গায়ে? তাই এমন পরিবর্তন?

কৃষ্ণকিশোর সমানে কথা বলে যাচ্ছিলেন, 'তুই আর মেজ খুকি আজ রাঁধবি। মালাইকারি, কাতলার কালিয়া, মুগের ডাল, আলু আর পটল ভাজা, আমের চাটনি। ট্যাংরাটা আজ থাক। এত সব করতে হলে রাত কাবার হয়ে যাবে। সন্দেশ পান্তুয়া তো নিয়েছিই। পাড়ার 'নকুল মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' থেকে মিষ্টি দই কিনে নেব। দইটা ওরা খাসা করে।' একটু থেমে বললেন, 'তোদের রান্নায় আমি হেল্প করব। আর

তোর মাকে কাছে একটা চেয়ারে বসিয়ে রাখব। সে ডিরেকশান দেবে।' খুশিতে উদ্দীপনায় তাঁর চোখমুখ জ্বলজ্বল করছে।

দেশপ্রিয় পার্ক ছাড়িয়ে যাবার পর হঠাৎ যেন খেয়াল হল কৃষ্ণকিশোরের, মেয়ে প্রায় কিছুই বলছে না। তাঁর কথায় জবাবে মাঝে মধ্যে হুঁ হাঁ করছে। একটু যেন অবাক হলেন, 'কি রে, তুই অত চুপচাপ কেন? কতকাল পর ভাল খাওয়া দাওয়া হবে। তোর আনন্দ হচ্ছে না?'

সুতপা বলল, 'একটা কথা আমি ভেবে পাচ্ছি না বাবা—'

'কী কথা?'

'কত বাজার করেছ। এই টাকা তুমি পেলে কোথায়?'

মজাদার ভঙ্গিতে ভুরু কুঁচকে, ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে অদ্ভুত এক প্রহেলিকা সৃষ্টি করেন কৃষ্ণকিশোর। মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, 'তুইই বল না, কোথায় পেলাম?'

সুতপা বলল, 'বা রে, আমি কেমন করে জানব!'

'ব্যাঙ্কে আমার অ্যাকাউন্টে সতের শো সাতাত্তর টাকা ছিল। আমি তার থেকে এক হাজার তুলে ফেলেছি। অ্যাকাউন্ট চালু রাখতে মিনিমাম পাঁচশো টাকা ডিপোজিট রাখতে হয়। আমার তার চেয়ে বেশিই রয়েছে।'

সুতপা আঁতকে ওঠে। কৃষ্ণকিশোরের মাথাটা যে পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে, সে সম্বন্ধে তার আর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। গোঙানির মতো আওয়াজ করে সে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমাদের এত অভাব, এত কষ্ট! আর তুমি কিনা অতগুলো টাকার সর্বনাশ করে কালিয়া মালাইকারির ব্যবস্থা করলে! হাজার টাকা হাতে থাকলে অন্তত ক'টা দিন খাওয়ার চিন্তা থাকে না। তুমি কী!'

কৃষ্ণকিশোর চিরকালই হিসেবি। অপব্যয় একেবারেই পছন্দ করেন না। বিলাসিতাকে কোনও দিন প্রশ্রয় দেন নি। অফিস বন্ধ হয়ে যাবার পর একটা পয়সা খরচ করতে দশবার ভাবেন। সেই মানুষটা ব্যাঙ্ক থেকে জমানো টাকা তুলে উড়নচণ্ডের মতো আজ দু'হাতে খরচ করছেন। দেখে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে সুতপা। বিচলিত এবং উৎকণ্ঠিতও।

কৃষ্ণকিশোর মেয়ের উদ্বেগ, বিরক্তি এবং ধিক্কারকে আমলই দিলেন না। হেসে হেসে বললেন, ক'টা টাকার জন্যে এত চিন্তা করছিস কেন?'

সুতপা রেগে যায়, 'আমাদের মতো ফ্যামিলির পক্ষে এক হাজার সামান্য টাকা! দু'টো পয়সার জন্যে তুমি আর আমি সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত মুখে রক্ত তুলে খাটছি। আর তুমি কিনা—তুমি কিনা—' একটু থেমে ফের শুরু করে, 'রাজবাড়ির ভোজের আয়োজন করে ফেললে!'

কৃষ্ণকিশোর সুতপার কাঁধে একখানা হাত রেখে হালকা গলায় বললেন, 'বছরের পর বছর একঘেয়ে চলছে। আজ একটু অন্যরকম হোক না—'

সুতপার গজগজানি থামে না, 'গেল মাসে ডাক্তার পালচৌধুরি মায়ের জন্য প্রেসক্রিপশন করে দিলেন। টাকার জন্যে দু-তিনটে ওষুধ কেনা হয়নি। আর তোমার—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে কৃষ্ণকিশোর নিজের পকেট থেকে একটা চার ভাঁজ-করা প্রেসক্রিপশন বার করে বললেন, 'এই দ্যাখ, সঙ্গে ওটা নিয়ে এসেছি। ভেবেছিলাম গড়িয়াহাট থেকে কিনে নেব। একদম ভুলে গেছি—'

ট্যাক্সি লেক মার্কেটের কাছে চলে এসেছিল। এখানে পর পর ক'টা বড় ওষুধের দোকান। ব্যস্তভাবে ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে গেলেন কৃষ্ণকিশোর। ওষুধ কিনে ফিরে এসে গাড়িতে বসতেই আবার সেটা দৌড় শুরু করল।

আগের কথার খেই ধরে সুতপা বলল, 'ওষুধ না হয় হল। তোমার ধুতিগুলো এত পুরনো যে পিঁজে পিঁজে গেছে। নান্টুর জুতো আর প্যান্ট কেনা দরকার—'

এ জাতীয় ছোটখাটো সাংসারিক সমস্যা নিয়ে আজ মাথা ঘামাতে আদৌ রাজি নন কৃষ্ণকিশোর। তরল গলায় বললেন, 'তুই অত ভাবিস না তো। সব হয়ে যাবে।'

সুতপা ঝাঁঝের সুরে বলল, 'হবে হবে তো বলছ, কিন্তু কীভাবে? শুধু শুধু অতগুলো টাকা শেষ করে এলে। ওই টাকায় জামাকাপড়গুলো হয়ে যেত। হঠাৎ তোমার কী যে হল! কোনও মানে হয়!'

মেয়ের রাগ, বিরক্তি দেখে বোধহয় মজাই পাচ্ছিলেন কৃষ্ণকিশোর। বললেন, 'অত রাগারাগি করিস না ছোট খুকি। দু-চার দিন দ্যাখ। শুধু নান্টু আর আমরাই না, তোর মা, মেজ খুকি আর তোর জন্যেও কাপড়চোপড় কিনে ফেলব।' একটু থেমে বললেন, 'তিনটে মোটে ভাল শাড়ি তোর। দু'বছর ধরে তাই বাড়িতে কেচে, ইস্তিরি করে চালিয়ে নিচ্ছিস। রোজ তোকে বাইরে বেরোতে হয়। ওই ক'টা কাপড়ে চলে! কত পুরনো হয়ে গেছে!'

আজ কৃষ্ণকিশোর সত্যিই দুর্দান্ত এক ম্যাজিশিয়ান। একে পর এক যাদুর খেলা দেখিয়ে যেন তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন। হতবুদ্ধি সুতপা পলকহীন বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে।

চেতলা ব্রিজ পার হয়ে খানিকটা এগিয়ে বাঁ দিকে মোড় ঘুরে দু'টো রাস্তা পেছনে ফেলে আবার ডাইনে মোড়। ডান দিকের রাস্তা ধরে অনেকটা যাবার পর কোনাকুনি যে গলিটা পড়ল সেটাই নরেশ আড্ডি রোড।

ট্যাক্সি গলির মুখে আসতেই দেখা গেল, পাশের 'গণেশ কেবিন'-এ বসে বন্ধুদের সঙ্গে গুলতানি করছে নান্টু।

চেতলা ক' বছরে প্রায় পালটে গেছে। প্রোমোটাররা পুরনো জরাজীর্ণ বাড়ি, বস্তি ভেঙে নতুন নতুন হাই-রাইজ তুলেছে। সেগুলোর ঝাঁ-চকচকে চেহারা। এখনও যে ক'টা ধুঁকে ধুঁকে টিকে আছে সেগুলোর আয়ুও ফুরিয়ে এসেছে। দু-চার বছরের মধ্যে ওগুলোর অস্তিত্ব থাকবে না। ধুলোয় মিশিয়ে দেবার পর সেই সব জায়গায় উঠবে একের পর এক অ্যাপার্টমেন্ট হাউস।

চোখ-ধাঁধানো বিল্ডিংয়ের সারি, ঝকঝকে রাস্তা, আন্ডারগ্রাউন্ড সিউয়ারেজ সিস্টেম। পাঁচ সাত বছর পর আচমকা কেউ যদি এখানে এসে পড়ে, এই চেতলাকে চিনতেই পারবে না।

অনেক কিছু বদলে গেছে। এবং লহমায় লহমায় আরও পালটে যাচ্ছে। কিন্তু পরিবর্তন নেই 'গণেশ কেবিন'-এর। সেই কোন মান্ধাতার আমলে নরেশ আড্ডি রোডের এক পুরনো বাসিন্দা গণেশ মণ্ডল। নিজের নামে এই রেস্টুরেন্টটা খুলছিল। হয়ত ভেবেছিল, এইভাবে তার নাম অমর হয়ে থাকবে। গণেশ মণ্ডল কবেই মরে ভুত হয়ে গেছে। কিন্তু 'গণেশ কেবিন' এখনও স্বমহিমায় বিরাজ করছে। মলিন চেহারা। সেকেলে কাঠের টেবল-চেয়ার। টেবলক্লথগুলো ময়লা, চায়ের ছোপ-ধরা। আদ্যিকালের একটা ফ্যান ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করে কোনও রকমে ঘুরে যায়। তাতে কতটুকু হাওয়া পাওয়া যায়, বলা মুশকিল। হয়ত এটাই বোঝানো, দেখ আমাদের একটা ফ্যান আছে। 'গণেশ কেবিন' একেবারে ফ্যালনা নয়। রেস্টুরেন্টটার পেছনের দেওয়ালে বড় সড় চৌকো একটা ফোকর। তার ওধারে কিচেন। সেখানে চা, টোস্ট তৈরি হয়। চপ, কাটলেট ভাজা হয়।

গণেশ মণ্ডলের পর এখন রেস্টুরেন্টটা চালাচ্ছে তার ছেলে ধীরেন মণ্ডল। তার বয়সও পঞ্চাশ পেরোতে চলল। রাস্তার দিকের এক পাশে উঁচু চেয়ার-টেবলে বসে ক্যাশ আগলায় ধীরেন আর চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে দাপটে পৈতৃক কারবার চালায়। তবে পাড়ার বেকার ছেলেছোকরাদের সম্বন্ধে তার প্রচুর সহানুভূতি। রেস্টুরেন্টের এক কোণে সকাল থেকে রাত্তিরে ঝাঁপ বন্ধ হওয়া অব্দি তাদের আড্ডা মারতে দেয়। যাবেই বা কোথায় ছেলেগুলো? এই আড্ডার একজন স্থায়ী মেম্বার নান্টু।

মোড় ঘুরতে ট্যাক্সির স্পিড অনেক কমে গিয়েছিল। জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে কৃষ্ণকিশোর গলা উঁচুতে তুলে ছেলেকে ডাকতে লাগলেন, 'নান্টু—নান্টু—'

নান্টু চমকে রাস্তার দিকে তাকাল। চমকের কারণ দু'টো। এক নম্বর, গত সাত আট বছরের মধ্যে বাবাকে কখনও ট্যাক্সিতে চড়তে দেখে নি সে। দু' নম্বরটা হল, ছোটদি অর্থাৎ সুতপা কোনওদিন বাবার সঙ্গে বাড়ি ফেরেনি।

বিস্ময়টা কেটে গেলে তিন লাফে 'গণেশ কেবিন' থেকে বাইরে বেরিয়ে এল নান্টু। ট্যাক্সিটা থামিয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণকিশোর। পকেট থেকে এক গোছা নোট ছেলেকে দিয়ে বললেন, 'নকুল মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' থেকে কিলো দেড়েক মিষ্টি দই কিনে বাড়ি চলে আসবি। —চল ট্যাক্সিওলা।'

নান্টু হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। দেড় কিলো দই কবে তাদের বাড়ি ঢুকেছে, মনে করতে পারল না।

'গণেশ কেবিন' থেকে চোদ্দটা বাড়ির পর 'মহামায়া ধাম'। একটু পরেই ট্যাক্সিটা সেটার সামনে এসে থামল।

তিন

'মহামায়া ধাম' সেকেলে ধাঁচের খুব সাদামাঠা তেতলা বাড়ি। মাথায় যতটা উঁচু, চওড়ায় ততটা নয়। প্রতিটি ফ্লোরে তিনটের বেশি ঘর নেই। এক তলায় রান্নাঘর এবং খাবার ঘর, বাকি ঘরগুলো ফাঁকা পড়ে থাকে। দোতলাটা জমজমাট। সেখানে থাকে সুতপা, নান্টু এবং তাদের মেজদি নমিতা, যার ডাকনাম মেজ খুকি। তেতলার সব চেয়ে বড় ঘরটা কৃষ্ণকিশোর এবং সুতপার মা রাজেশ্বরীর। বাকি দু'টো ঘর দিনের বেলায় খোলা থাকে। রাত্তিরে শেকল তুলে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়।

সত্তর বছর আগে চেতলার এদিকটা তেমন দানা বাঁধে নি। বাড়িঘর কম, ঝোপঝাড়ে বোঝাই বিস্তর খালি জমি। পোকামাকড় সাপখোপের স্থায়ী আস্তানা। রাতের দিকে আদিগঙ্গার দিক থেকে ঝাঁক বেঁধে এসে শিয়ালেরা হাঁকডাকে এলাকা মাতিয়ে রাখত।

সেই সস্তাগণ্ডার দিনে প্রায় জলের দরে এখানে সাড়ে সাত কাঠা জমি কিনে স্ত্রী মহামায়ার নামে বাড়িটা তৈরি করেছিলেন সুতপার ঠাকুরদা নন্দকিশোর। তখন খাস ইংরেজ রাজত্ব। এক ব্রিটিশ কোম্পানিতে মোটামুটি চাকরি করতেন তিনি। অনেকগুলো ভাইবোন, বিধবা মা। মাইনের টাকায় সংসার চালিয়ে তাঁর পক্ষে কলকাতা তো দূরের কথা, তার আশপাশেও বাড়ি টাড়ি তৈরির কথা ভাবা যেত না। কিন্তু নন্দকিশোর উচ্চাকাঙ্ক্ষী, করিৎকর্মা পুরুষ। এবং খুবই পরিশ্রমী। অফিস ছুটির পর ছোটখাট কী সব ব্যবসা ট্যবসা করতেন। সেই টাকাতেই জমি কিনে এই বাড়িটা তৈরি করেছিলেন।

'মহামায়া ধাম' ছিরিছাঁদহীন, বেঢপ চোহারার হলেও চারপাশে অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা। একসময় সেখানে বিপুল উদ্যমে বাগান করার চেষ্টাও হয়েছিল। লাগানো হয়েছিল নানা ধরনের ফুল আর ফলের গাছ। সেই সব গাছ-গাছালি যত্নের অভাবে মরে হেজে শেষ হয়ে গেছে। প্রচণ্ড আয়ুর জোর ছিল বলে ক'টা

সুপুরি, নারকেল আর পেয়ারা গাছ এখনও টিকে আছে। বাড়ির পেছন দিকটায় আগাছার জঙ্গল, সেখানে মরা মরা পাঁশুটে রঙের ঘাসের জমির ভেতর দিয়ে সুরকির একটা রাস্তা মূল বাড়িটায় গিয়ে ঠেকেছে।

'মহামায়া ধাম' তৈরি হবার পর দু-একবার হয়ত মেরামত করে রং টং করা হয়েছিল। সে সব কত কাল আগের ঘটনা। সুতপা তার জন্মের পর কখনও এই বাড়িটায় হাত পড়তে দেখে নি। নানা জায়গায় প্ল্যাস্টার খসে খসে নোনা-লাগা ইট বেরিয়ে পড়েছে। কার্নিস ভাঙা। জং ধরে ধরে রেন-ওয়াটার পাইপগুলোর গায়ে বিরাট বিরাট গর্ত। বর্ষায় হুড় হুড় করে জল বেরিয়ে এসে চারদিক থই থই করতে থাকে। বাউন্ডারি ওয়ালগুলোর নানা জায়গা ধসে পড়েছে। যে কেউ যেখান দিয়ে খুশি বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়তে পারে।

সদর দরজা হাট করে খোলা ছিল। মূল বাড়িটার সামনের দিকে লোহার আঁকশিতে একটা বাল্ব ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সন্ধে হলেই ওটা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। যথারীতি আজও জ্বলছে। ফলে ভিতর দিকে সদর পর্যন্ত জায়গাটা আলোয় ভরে আছে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ডিকির মালপত্র বার করে ভাড়া মিটিয়ে দিলেন কৃষ্ণকিশোর। তিনি নিজে নিয়েছেন দু'টো ঢাউস ব্যাগ। সুতপার হাতে আরও একটা।

হই হই করতে করতে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লেন কৃষ্ণকিশোর। 'মেজ খুকি শিগগির নিচে আয়। আমার হাত ছিঁড়ে পড়ছে।'

দোতলার সামনের দিকের রেলিং-দেওয়া বারান্দায় মেজ খুকি অর্থাৎ নমিতা এসে দাঁড়াল। বয়স বত্রিশ তেত্রিশ। হুবহু সুতপার আদলটি তার চেহারায় বসানো। মন যেন বিষণ্ন। কী এক মানসিক ক্লেশে নুয়ে আছে যেন। সুতপা আর বাবার হাতের ব্যাগ ট্যাগ দেখে কয়েক পলক অবাক তাকিয়ে থাকে সে। তারপর ভীষণ ব্যস্ত পায়ে তর তর করে নিচে নেমে এসে কৃষ্ণকিশোরের হাত থেকে একটা ব্যাগ নিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। দেখামাত্র সে বুঝে গেছে ব্যাগগুলো মাছ আনাজ এবং মিষ্টির হাঁড়ি আর প্যাকেটে বোঝাই। হাঁটতে হাঁটতে কৃষ্ণকিশোর আর সুতপার দিকে হতবুদ্ধির মতো বার বার তাকাচ্ছিল সে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, এত বাজার করেছ!' খরচের কথাটা আর জানতে চাইল না।

সুতপা বলল, 'বাবা আলিবাবার মতো দস্যুদের গুহার খোঁজ পেয়েছে।'

মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছে না নমিতা। বিস্ময়টা তার কয়েক গুণ বেড়ে গেল। তবে এ নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করল না।

কৃষ্ণকিশোর নমিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর মা এ-বেলা কেমন আছে রে?'

নমিতা বলল, 'ও-বেলার থেকে অনেকটা ভালো—'

'ভেরি গুড।

কথা বলতে বলতে সবাই একতলার বারান্দায় চলে এসে ছিল। এখানে বাইরের দিকের বাল্বটাই যা জ্বলছে। নইলে পুরো গ্রাউন্ড ফ্লোরটা অন্ধকার।

হাতের ব্যাগ নামিয়ে কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'তোদের মা যখন একটু সুস্থ আছে তখন আর চিন্তা নেই। এক কাজ কর, একতলার সব লাইট জ্বালিয়ে দে। তারপর বাজারের জিনিসগুলো রান্নাঘরে নিয়ে গুছিয়ে রাখ। ছোট খুকি আর আমি ধরে ধরে তোদের মাকে নিচে নামিয়ে আনি।'

অসুস্থ, রোগা মানুষটাকে টেনে হেঁচড়ে একতলায় নিয়ে আসার কথায় নমিতা খুশি হয় নি। তা ছাড়া, বেশ হতভম্বও হয়ে গিয়েছিল। বলল, 'মা এখানে এসে কী করবে?'

'বাঃ! কতকাল পর বাড়িতে এত বাজার এল। তোর মা দেখবে না? তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

নমিতার এই প্রশ্নটার জবাব দিল সুতপা, 'আজ তো আর ডাল ভাত চচ্চড়ি হবে না। হবে কাতলা মাছের কালিয়া, চিংড়ি মাছের মালাইকারি, চাটনি—এইসব। বাবা তোর আর আমার ওপর ভরসা করতে পারছে না। রান্নার সময় মা আমাদের গাইড করবে।'

এক গাল হেসে কৃষ্ণকিশোর সুতপাকে তাড়া লাগালেন, 'চল—চল। রান্না চাপাতে দেরি হলে খেতে খেতে অনেক রাত হয়ে যাবে।' নমিতাকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি উনুন ধরিয়ে দিস।' এ-বাড়িতে এখনও গ্যাস আসে নি। সাবেক নিয়মে কয়লা দিয়ে কাজ চালানো হয়।

টানা বারান্দার শেষ মাথায় ওপরে ওঠার সিঁড়ি। দোতলাটা অন্ধকার। একতলার মতো এখানেও লম্বা বারান্দায় একটা কম-পাওয়ারের ঝুলন্ত বাল্ব টিম টিম করে জ্বলছে।

সুতপারা সোজা তেতলায় উঠে এল। সেই একই রকম বারান্দা, বাল্বের আলো। দু'টো ঘরে এর মধ্যেই তালা পড়ে গেছে। কোণের দিকের বড় ঘরটায় অবশ্য জোরালো বাতি জ্বলছে। সুতপারা সেখানে চলে এল।

প্রকাণ্ড ঘরের মাঝখানে পুরনো ধাঁচের ভারী খাট। দেওয়াল ঘেঁষে তিনটে মস্ত কাঠের আলমারি। একধারে ড্রেসিং টেবল, কুশন। খাটের তলায় স্তূপাকার জিনিসপত্র—টিনের বাক্স, তোরঙ্গ, নিচু জলচৌকি, সেকেলে তামা-কাঁসার বাতিল

বাসনকোসন ইত্যাদি। আসবাবগুলোর পালিশ উঠে গিয়ে কবেই কাঠ বেরিয়ে পড়েছে। খাটের ছত্রি নেই। জানালায় দড়ি দিয়ে বেঁধে মশারি টাঙানো হয়। আলমারির পাল্লার কাচ এবং ড্রেসিং টেবলের আয়না বেশির ভাগটাই ভেঙেচুরে গেছে। দেওয়াল, মেঝে, যেদিকেই তাকানো যাক, সর্বত্র পুরু মলিন ছাপ। সিলিং থেকে চাকলা চাকলা সিমেন্টের প্রলেপ খসে পড়ে দগদগে ঘায়ের মতো দেখায়।

খাটের মাঝখানে বসে ছিলেন রাজেশ্বরী। কৃশ, হাড়সার চেহারা। গাল ভাঙা, চোখের কোলে চিরস্থায়ী কালির ছোপ। ঢিলে চামড়া কুঁচকে গেছে। চুল উঠে উঠে কপালটা মাঠের মতো দেখায়। সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর। কপালেও সিঁদুরের মস্ত টিপ।

ক'বছর আগে একটা স্ট্রোক হয়ে গিয়েছিল রাজেশ্বরীর। তারও আগে থেকেই রয়েছে হাঁপানির টান। শীতে আর বর্ষায় সেটা ভীষণ বাড়ে। তা ছাড়া রয়েছে সুগারের সমস্যা। কিডনিটাও দ্রুত অকেজো হয়ে যাচ্ছে। সারাদিনই তিনি শীর্ণ শরীর এলিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকেন। জীবনীশক্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

উৎকণ্ঠিতের মতো খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলেন রাজেশ্বরী। কৃষ্ণকিশোররা ঘরে ঢুকতেই নিস্তেজ সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে? নিচে এত চেঁচামেচি হচ্ছিল কেন? গলা অত চড়িয়ে কী বলছিলে তুমি?'

কৃষ্ণকিশোর হাসতে লাগলেন, 'আরে বাপু, কিচ্ছু হয় নি। মনে খুশির ভাব জেগেছিল। তাই গলাও চড়ে গিয়েছিল।' পকেট থেকে ব্রাউন রঙের খামে বোঝাই ওষুধ বার করে দু'টো ট্যাবলেট স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন, 'ডাক্তার রাহা সেদিন যে প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন, তার সব ওষুধ কিনে এনেছি। সন্ধেবেলায় এই ট্যাবলেট দু'টো খাবার কথা।—ছোট খুকি তোর মাকে জল দে।'

ঘরের এককোণে উঁচু টুলের ওপর গোড়া মাটির কুজো আর কাচের গেলাস রয়েছে। জল এনে সুতপা মাকে দিল।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন রাজেশ্বরী। পলকহীন। বললেন, 'এত দামি ওষুধ। আজ সকালেও বললে, কবে কিনতে পারবে, ঠিক নেই। হঠাৎ টাকা পেলে কোথায়?'

'পেয়ে গেলাম।' আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে হেঁয়ালির সুরে কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'নাও, চটপট ওষুধটা খেয়ে নাও। এখন অনেক কাজ।'

কথামতো ট্যাবলেট দু'টো খেলেন রাজেশ্বরী। তাঁকে ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছে। বললেন, 'ব্যাঙ্কে যে ক'টা টাকা ছিল, তুলে ফেলেছ নাকি?'

'ও নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমরা হাত ধরছি। আস্তে আস্তে খাট থেকে নামো—'

'নামতে বলছ কেন?'

'দিবারাত্রি তো তেতলার এই খাটে শুয়ে থাকো। দিনের পর দিন ঘরবন্দি অবস্থা। আজ তোমাকে একতলায় নিয়ে যাব।'

সবিস্ময়ে রাজেশ্বরী বললেন, 'একতলায়? সেখানে গিয়ে কী হবে?'

'এত জেরা কোরো না তো।' কৃষ্ণকিশোরের চোখে-মুখে কণ্ঠস্বরে নকল বিরক্তি।

সুতপা আর কৃষ্ণকিশোর দু'দিক থেকে দু'হাত ধরে রাজেশ্বরীকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন। বারান্দার শেষ মাথায় এসে সযত্নে সিঁড়ি দিয়ে নামাতে নামাতে কৃষ্ণকিশোর জিজ্ঞেস করলেন, 'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

বহুকাল সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামার অভ্যাস নেই। দু'তিন মাস পর হয়ত নান্টু বা কৃষ্ণকিশোর তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। বাইরে ওইটুকুই যা যাতায়াত। কষ্ট যে হচ্ছিল না তা নয়। বাপ-মেয়ে কেন একতলায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে সে জন্য যথেষ্ট কৌতূহলও হচ্ছিল রাজেশ্বরীর। বললেন, 'না, তেমন কিছু নয়। তোমরাই তো ধরে আছ।'

কৃষ্ণকিশোরের মুখ লহমার জন্যও থামছে না। সমানে বক বক করে চলেছেন তিনি, 'কয়েক দিনের ভেতর কলকাতার টপ স্পেশালিস্টদের দিয়ে তোমার ট্রিটমেন্ট করাব। ডাক্তার রাহার মতো একজন অর্ডিনারি এম বি বি এস-এর হাতে তোমাকে ফেলে রাখব না।'

স্পেশালিস্ট দেখাবার কথা আগেও অনেকবার বলেছেন কৃষ্ণকিশোর। সদিচ্ছাটা যোল আনাই ছিল। রুগ্ণ, শয্যাশায়ী স্ত্রী সুস্থ হয়ে উঠবে, কে আর না তা চায়। কিন্তু স্পেশালিস্টদের যা ফীজ, শরীরের নানারকম টেস্টের যা খরচ, ওষুধের যা দাম, তার যোগান দেবে কে? অত টাকা কোথায় পাবেন কৃষ্ণকিশোর?

অন্য সব বারের মতো আজও শুনেই গেলেন রাজেশ্বরী। উত্তর দিলেন না।

কৃষ্ণকিশোর থামেন নি, 'দু'টো মাস খালি টাইম দাও। তোমাকে পুরো ফিট করে দেব। সাত আট বছর আগে যেমন ছিলে, ঠিক সেইরকম।'

এবারও চুপ করে রইলেন রাজেশ্বরী।

একতলায় এসে দেখা গেল, নান্টু এর ভেতর মিষ্টি দই নিয়ে চলে এসেছে। নমিতা আনাজ, মাছ, ফল, সন্দেশের বাক্স, দই আর পান্তুয়ার হাঁড়ি রান্নাঘরের একধারে গোছগাছ করে রেখে উনুন ধরাবার তোড়জোড় করছে।

কৃষ্ণকিশোর স্ত্রীকে বললেন, 'অনেকদিন পর আজ মনের মতো একটু বাজার করলাম। মাছ টাছগুলো দেখ—' তাঁর চোখেমুখে তৃপ্তির ছটা।

বাজার করার বহর দেখে ছেলেমেয়েদের মতো রাজেশ্বরীও অবাক হয়ে

গেছেন। সুতপা যা বলতে পারে নি, ফস করে তাঁর মুখ দিয়ে সেটাই বেরিয়ে এল, 'তোমার কি মাথা টাথা খারাপ হয়ে গেছে? টাকা পেলে কোথায়?'

সুতপাকে যে জবাবটা দিয়েছিলেন, স্ত্রীর কাছেও তাই পেশ করলেন কৃষ্ণকিশোর।

শুনে প্রায় খেপে উঠলেন রাজেশ্বরী। দুর্বল শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব উঁচুতে তুলে বললেন, 'সামান্য কিছু জমানো ছিল। তার থেকে টাকা তুলে নয় ছয় করে এলে! হঠাৎ একটা বিপদ আপদ ঘটলে কী হবে তখন?'

ছেলেমেয়েদের হতচকিত ভাব, স্ত্রীর রাগারাগি এবং উৎকণ্ঠা—এসব দেখতে দেখতে ভীষণ মজা পাচ্ছিলেন কৃষ্ণকিশোর। মিটি মিটি হাসতে হাসতে বললেন, 'কত আর খরচ করেছি! খুব বেশি হলে ছ-সাত শো টাকা। বড় বিপদ এলে ওই টাকা দিয়ে কি ঠেকানো যাবে?'

'তাই বলে—'

স্ত্রীকে থামিয়ে কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'রোজই তো টাকার চিন্তায় মাথার ঘায়ে কুকুর পাগলের মতো অবস্থা। একটা দিন অন্তত ওই ব্যাপারটা থেকে রেহাই দাও—'

তেতলা থেকে এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামা, উত্তেজনা, চেঁচামেচি, সব মিলিয়ে হাঁপিয়ে পড়েছিলেন রাজেশ্বরী। হাত পা মাথা ভীষণ টলছিল। হঠাৎ নজরে পড়তেই তাঁর হাতটা জোরে আঁকড়ে ধরলেন কৃষ্ণকিশোর। ব্যস্তভাবে ছেলেকে বললেন, 'নান্টু, তাড়াতাড়ি খাবার ঘর থেকে চেয়ার এনে বাইরে পেতে দে।'

রান্নাঘরের লাগোয়া খাবার ঘর। মাঝখানের দেওয়ালে যাতায়াতের জন্য দরজা। কৃষ্ণকিশোরের বাবা নন্দকিশোরের আমলে কিছু কিছু বিলিতি কেতা এ-বাড়িতে চালু করা হয়েছিল। তার একটা হল টেবল চেয়ারে বসে খাওয়া। সত্তর বছর আগেকার সেই সব চেয়ার টেয়ারের জীর্ণ দশা। নেহাত বর্মা টিকের তৈরি, তাই এখনও কোনওরকমে কাজ চলে যাচ্ছে।

নান্টু দৌড়ে দু'খানা চেয়ার এনে সামনের দিকের ঘাসের জমিতে পেতে দিল। সুতপা আর কৃষ্ণকিশোর রাজেশ্বরীকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। রাজেশ্বরী জোরে জোরে বারকতক শ্বাস টেনে খানিকটা সামলে নিলেন।

পাশের চেয়ারে বসে উদ্বিগ্ন মুখে কৃষ্ণকিশোর জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, শরীর খুব খারাপ লাগছে?'

আস্তে মাথা নাড়লেন রাজেশ্বরী, 'দম নিতে কষ্ট হচ্ছিল। এখন ঠিক আছি।'

'ভেবে দেখ, এখানে বসে থাকতে পারবে কি না। যদি বল তো, ওপরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিই।'

ক'বছর ধরে কৃষ্ণকিশোরের একটা চেহারাই রাজেশ্বরীর চেনা। রুক্ষ। খিটখিটে। অভাবের চাপে দুমড়ে যাওয়া একটা মানুষ। প্রতিটি পয়সা টিপে টিপে খরচ করে এসেছেন। সেই লোকটা আজ হালকা মেজাজে রয়েছে। উড়নচণ্ডের মতো দু'হাতে টাকা উড়িয়ে এসেছে। স্বামীকে নিয়ে এই মুহূর্তে রাজেশ্বরীর শঙ্কা বা উদ্বেগ যতখানি, কৌতূহল তার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়। সকালে যাঁকে একরকম দেখেছেন, সন্ধেবেলায় তিনি পুরোপুরি অন্যরকম। সুতপা নান্টু বা নমিতার মতো রাজেশ্বরীর মাথায় একটাই প্রশ্ন। কোন ভোজবাজিতে এত দ্রুত এমন পরিবর্তন? সেটা না জানা পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই।

রাজেশ্বরী বললেন, 'ওপরে টেনে তোলার দরকার নেই। অনেকদিন পর নিচে নেমেছি। সারা দিনের গুমোট ভাবটা কেটে গিয়ে হাওয়া ছেড়েছে। বেশ ভাল লাগছে। এখানেই বসে থাকি।'

কৃষ্ণকিশোরের মুখ আলো হয়ে ওঠে। বালকের মতো উচ্ছ্বাসের সুরে বলেন, 'ভেরি গুড। তুমি এখানে থাকলে আমাদের উৎসাহ দশ গুণ বেড়ে যাবে।' ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোদের মায়ের ডিরেকশান ছাড়া কি ভাল রান্না হয়? ওর হাত দু'টো সোনা দিয়ে বাঁধানো। শরীর খারাপের জন্যে এখন না হয় উনুনের ধারে যেতে পারে না। যখন সুস্থ ছিল, আচ্ছা আচ্ছা লোক ওর রান্না খেয়ে হাত পর্যন্ত চাটত। বলত, ফাইভ স্টার হোটেলের কুকরা ওর কাছে রান্না শিখতে পারে।'

কৃষ্ণকিশোর সমস্ত ব্যাপারেই আজ বাড়াবাড়ি করছেন। খুব সম্ভব, সবাইকে মাতিয়ে রাখতে চান। সুতপারা হাসল ঠিকই, কিন্তু সেই প্রশ্নটা মস্তিষ্কে, না বুকের ভেতর কোথায় যেন খচখচ করছে। হুট করে বাবা এতগুলো টাকা খরচ করে রাজসূয় যজ্ঞের মতো এলাহি একটা কাণ্ড করে বসল কেন?

উনুন ধরার পর কয়লার ধোঁয়া কেটে গেলে ঘাসের জমি থেকে রান্নাঘরের তিন দিক খোলা বারান্দায় রাজেশ্বরীকে এনে বসানো হল। তাঁরই নির্দেশে নমিতা আলু পেঁয়াজ পটল ইত্যাদি কাটতে লাগল। সুতপা মাছ টাছ পরিষ্কার করে ধুয়ে নুন হলুদ মাখাতে থাকে। কৃষ্ণকিশোর চাল টাল ধুতে লাগলেন। চিংড়ির মালাইকারি করার মতো গরম মশলা এবং নারকেল বাড়িতে নেই। অগত্যা নান্টুকে বাজারে ছুটতে হল। সারা পরিবার আজকের ভোজের জন্য যৌথভাবে হাত লাগিয়েছে। এমন ঘটনা এ-বাড়িতে আগে আর কখনও হয় নি।

রান্নাবান্না শেষ হতে হতে এগারোটা বেজে গেল। তারপর খাওয়ার পালা।

খাবার ঘরের মস্ত টেবলের মাঝখানে নানা ধরনের স্টেনলেস স্টিলের পাত্রে ভাত, ডাল, ভাজাভুজি, মাছ, দই, মিষ্টি এবং টুকরো টুকরো কাটা আম সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আর রয়েছে নুনের কৌটো। একটা বড় প্লেটে স্তূপাকার পেঁয়াজ, টমাটো এবং শশার ফালি। সেই সঙ্গে অনেকগুলো ঘন সবুজ কাঁচালঙ্কা। খুব সাদামাঠা স্যালাড। সবাই টেবল ঘিরে বসেছে। মধ্যমণি কৃষ্ণকিশোর। তাঁর উলটো দিকে মুখোমুখি বসেছেন রাজেশ্বরী। প্রত্যেকের সামনে ফাঁকা থালা, গেলাস। যে যার পছন্দমতো খাবার পাত্রগুলো থেকে চামচে করে তুলে নিয়ে খাবে। সুখাদ্যের গন্ধে সারা ঘর ম ম করছে।

খাবার ঘরে একটা ফ্যান রয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে সেটা অচল। কোণের দিকে রং-চটা ফ্রিজও চোখে পড়বে। সেটার হালও ফ্যানটার মতোই। বছর তিনেক ধরে সেটাও অকেজো। ফ্যান আর ফ্রিজ সারাবার মতো পয়সা যোগাড় করা যায় নি। হারিয়ে যাওয়া সুসময়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সেগুলো পড়ে আছে।

কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'অনেক রাত হয়ে গেছে। নে, সবাই শুরু কর।' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মাথা হেলিয়ে তাঁকেও খাদ্যবস্তু তুলে নিতে ইঙ্গিত করলেন।

রাজেশ্বরী চমকে ওঠেন, 'আমাকে এ-সব খেতে বলছ নাকি? আমি কি এত ঝালমশলাওলা রান্না খাই? এগুলো খেলে এমন হাঁপানির টান উঠবে যে বাঁচব না।' একটু থেমে বললেন, 'তোমরা খাও, আমি কাছে বসে দেখি। কতদিন ছেলেমেয়েগুলো ভাল করে খেতে পায় না।' তাঁর গলা ভারী হয়ে এল।

একটু চুপচাপ।

তারপর রাজেশ্বরী ফের বললেন, 'তোমাদের খাওয়া হলে মেজ খুকি আমাকে দুধ খই দেবে—'

'উহুঁ—' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালেন কৃষ্ণকিশোর, 'আজ তোমাকে আমাদের সঙ্গে একটু কিছু খেতেই হবে। চিংড়িটা তোমার সয় না। কালিয়া থেকে এক টুকরো রুই ভাল করে মুছে, ডাল দিয়ে ভাত মেখে তার সঙ্গে খাও। দু'টুকরো আম আর একটা সন্দেশও খাবে। পানতুয়াটা ভাজা মিষ্টি। ওটা থাক।'

'কী বলছ তুমি! ডাক্তার আমাকে সারাদিনে কী খেতে বলেছে, জানো না?'

'একদিন একটু এদিক ওদিক হলে কিচ্ছু হবে না। তা ছাড়া, সন্ধেবেলায় দু'টো স্ট্রং ট্যাবলেট দিয়েছি। তোমার খারাপ হবে বুঝলে কি ভাত মাছ মিষ্টি খেতে বলি?'

ছেলেমেয়েরাও বলতে লাগল, 'খাও মা। সেই কতকাল ধরে দুপুরে ভাত, চারা পোনার স্বাদগন্ধহীন পাতলা ঝোল আর রাত্তিরে দুই খই কি দুই পাঁউরুটি খাচ্ছ। আমরা সকলে খাব আর তুমি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এ হয় না।'

রাজেশ্বরী কিছুতেই খাবেন না। কিন্তু ছাড়াছাড়ি নেই। কৃষ্ণকিশোর উঠে এসে

দু' চামচ ভাত, এক চামচ ডলের ওপর দিকের পাতলা জলো অংশ আর খুব ভাল করে মুছে রুই মাছের এক টুকরো গাদা স্ত্রীর পাতে তুলে দিলেন।

প্রিয়জনদের এত ইচ্ছা, এমন আগ্রহ, রাজেশ্বরী আর না বলতে পারলেন না।

খেতে খেতে একটানা কথা বলছিলেন কৃষ্ণকিশোর। এই পারিবারিক ভোজসভায় তিনিই একমাত্র বক্তা। বাকি সকলে শ্রোতা। ধৈর্যশীল এবং উৎসুক।

'দু'টো মাস, ওনলি টু মান্থস—তার মধ্যে বাড়ির ভোল পুরোপুরি পালটে দেব। ছাদের কার্নিস ভেঙেচুরে গেছে। দেওয়ালের প্লাস্টার খসে খসে এমন হাল হয়েছে যে কহতব্য নয়। বর্ষায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঘরে জল ঢোকে। বাড়িটার সারা গায়ে কত যে বট-অশ্বত্থের চারা গজিয়েছে। আর দু-এক বছর এভাবে চললে ঠাকুরদার তৈরি তেতলা একদিন হুড়মুড় করে ঘাড়ের ওপর ধসে পড়বে।'

বিপুল উদ্দীপনায় কৃষ্ণকিশোর তাঁর পরিকল্পনার কথা সবিস্তার শোনাতে লাগলেন। বাড়িটা তো আগাপাশতলা মেরামত করাবেনই, ঘুণে-ধরা দরজা-জানলাগুলো পালটে ফেলবেন। তারপর রং করাতে হবে। নতুন রেন-ওয়াটার পাইপ লাগাবেন। নতুন করে বাউন্ডারি ওয়াল তৈরি করাবেন। পেছন দিকে যে আগাছার জঙ্গল হয়ে আছে, সে-সব সাফ করে বাগান করা হবে। সামনের দিকেও ফুল গাছ লাগাবেন।

কৃষ্ণকিশোর স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি তো রজনীগন্ধা, কাঁঠালি চাঁপা, রক্তজবা আর গোলাপ খুব পছন্দ কর। নার্সারি থেকে ওগুলোর চারা নিয়ে আসব। সেই সঙ্গে আম, কাগজি লেবু, গোলাপজাম, এমনি কিছু গাছের চারাও। ওদের বললে মালী ঠিক করে দেবে; সে এসে বাগান তৈরির দায়িত্ব নেবে।' নান্টুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাল হবে না, আমার কিছু আর্জেন্ট কাজ আছে। পরশু ভোরে গিয়ে রাজমিস্তিরি জয়নালকে ধরে নিয়ে আসবি। খিদিরপুরে থাকে। ঠিকানা দিয়ে দেব। কন্ট্রাক্টরদের কাউকে ডেকে বাড়ির কাজটা দেওয়া যায় কিন্তু তাদের গলা-কাটা দর। জয়নাল এক্সপার্ট মিস্তিরি। খুব যত্ন করে কাজটা করে। মজুরি রিজনেবল। যেটুকু দরকার তার চাইতে বাড়তি একটা পয়সাও খরচা করাবে না।' তিনি আরও জানালেন, বাড়ি মেরামত হলে নতুন ফ্রিজ আর ফ্যান কিনবেন। একটা ওয়াশিং মেশিনও। যে আসবাবগুলো প্রায় অকেজো হয়ে এসেছে সেগুলো ফেলে দিয়ে নতুন করে বানিয়ে নেবেন।

সবার খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একদৃষ্টে তারা কৃষ্ণকিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু বাড়ির ব্যাপারটা যৎসামান্য। কৃষ্ণকিশোরের পরিকল্পনা আরও ব্যাপক। আরও বিস্ময়কর। আস্তিনের ভেতর থেকে একের পর এক সেগুলো বার করে আনতে লাগলেন তিনি। খরচ চালানো সম্ভব হয় নি বলে পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল

নান্টুর। বেকার, বজ্জাত ছোকরাদের সঙ্গে 'গণেশ কেবিন'-এ সারাদিন আড্ডা মেরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দিনকাল ভীষণ খারাপ। আন্ডার-ওয়ার্ল্ডের মাফিয়ারা বেআইনি ড্রাগ চালান, অস্ত্র পাচার, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় ইত্যাদি কুকর্মের জন্য নতুন নতুন ছেলে রিক্রুট করে থাকে। হাতে পয়সা নেই, চাকরি নেই, লেখাপড়া বন্ধ, এ-ধরনের যুবকেরা খুব সহজেই তাদের টার্গেট হয়ে যায়। নান্টুও যে অন্ধকার জগতের চাঁইদের খপ্পরে পড়বে না, এমন গ্যারান্টি কে দেবে? হয়ত এর মধ্যেই সে ওদের নজরে পড়ে গেছে। কাল থেকে 'গণেশ কেবিন'-এ আর আড্ডা টাড্ডা নয়। কুসঙ্গ পুরোপুরি বাদ। দু-চার দিনের ভেতর আবার তাকে কলেজে ভর্তি করে দেবেন কৃষ্ণকিশোর।

এ ছাড়া আরও দু'টো বড় কাজ আছে। প্রথমটা হল সুতপার বিয়ে। সারাদিন শরীরের সব এনার্জি নিঙড়ে দিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনির পর মাসের শেষে কৃষ্ণকিশোর ক'টা পয়সা আর পান! ক'বছর ধরে সুতপা একাই সংসারটা প্রায় চালাচ্ছে। মেয়ের রোজগারের টাকায় বেঁচে থাকাটা যে কী গ্লানিকর, কীভাবে সারাক্ষণ তিনি কুঁকড়ে থাকেন, সেটা কৃষ্ণকিশোরই জানেন। সুতপা গত ডিসেম্বর আটাশ পেরিয়েছে। অনেক আগেই ওর বিয়েটা দেওয়া উচিত ছিল। পেরে ওঠেননি। এখন আর দেরি করবেন না। বাড়িটা সারানো হয়ে গেলেই বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলবেন।

কৃষ্ণকিশোরের দু'নম্বর কাজটা বেশ জটিল। মেজ খুকি অর্থাৎ নমিতা সুতপার চাইতে আড়াই বছরের বড়। বছর চারেক আগে বাড়ি থেকে পালিয়ে একটি ছেলেকে বিয়ে করে বসে। কিন্তু বিয়েটা আদৌ সুখের হয় নি। মাস ছয়েক কাটতে না কাটতেই শ্বশুর শাশুড়ি তার ওপর চাপ দিতে থাকে। 'মহামায়া ধাম'-এর একটা অংশ তাদের নামে লিখে দিতে হবে। নমিতার স্বামী তার মা-বাবার সুরে তাল দিতে থাকে। যে বাপের বাড়ি থেকে এক কাপড়ে বেরিয়ে এসেছে, এক কুচি সোনা কি দশটা টাকাও সঙ্গে করে আনে নি, শ্বশুরবাড়িতে তার জায়গাটা কোথায় নির্দিষ্ট হয়ে থাকে তা খুব সহজেই অনুমান করা যায়। শুরু হল নানরকম পীড়ন। প্রথমে গঞ্জনা, গালাগাল। পরে ধাপে ধাপে মাত্রাটা বাড়তে লাগল। খেতে না-দেওয়া, মারধর ইত্যাদি। মা-বাবার কাছে ফেরার মুখ ছিল না নমিতার। তবু ফিরতে হল। তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সরাসরি এসে কৃষ্ণকিশোরের কাছে বাড়ির ভাগ চাইল। তা হলেই সসম্মানে পুত্রবধুকে তারা ফিরিয়ে নেবে। কৃষ্ণকিশোর তাদের হাঁকিয়ে দিলেন। এই ব্যবস্থায় নমিতাও রাজি নয়। বেশ কিছুদিন টানাহ্যাঁচড়া চলল। তারপর নমিতার শ্বশুররা ডিভোর্সের মামলা আনল। কেস চালাবার মতো টাকাপয়সা নেই কৃষ্ণকিশোরের। ফলে একতরফা মোকদ্দমা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আশা করা যায়, আদালতের রায়ে খুব শিগগিরই ডিভোর্সটা হয়ে যাবে।

কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'ডিভোর্স হবার পর মেজ খুকি যদি ফের বিয়ে করতে

চায়, আমার আপত্তি নেই। এরকম বিয়ে আজকাল জলভাত। ও মুখ ফুটে বললেই খবরের কাগজের 'পাত্র-পাত্রী' কলমে বিজ্ঞাপন দেব। আর যদি ফের বিয়ে করতে রাজি না হয়, ওর ভবিষ্যতের জন্য ব্যাঙ্কে কিছু টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করে দেব। তার ইন্টারেস্টে ভালই চলে যাবে।'

নমিতা, সুতপা এবং নান্টু ছাড়াও কৃষ্ণকিশোরের আরও দুই ছেলে আর একটি মেয়ে আছে। তাদের সম্বন্ধে কোনও রকম উচ্চবাচ্য করলেন না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এদের যেন অস্তিত্বই নেই।

একনাগাড়ে বলার পর থামলেন কৃষ্ণকিশোর। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে চোখ ছোট করে, ঠোঁট টিপে হাসতে লাগলেন। তাঁর হাসিতে আত্মপ্রসাদ মেশানো। এবং অনেকখানি রহস্যও।

শ্রোতারা তাকিয়েই আছে। তাদের চোখ বিস্ফারিত। রুদ্ধশ্বাসে যেন কোনও রূপকথা শুনছে। অবিশ্বাস্য এবং অলৌকিক।

একসময় খুব আস্তে আস্তে নিশ্বাস ফেলে রাজেশ্বরী জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি এ-সব স্বপ্নে দেখেছ?'

কৃষ্ণকিশোরের ভুরু কুঁচকে গেল, 'মানে?'

'যা যা করবে বললে তার জন্যে কত টাকা দরকার, হিসেব করে দেখেছ?'

'নিশ্চয়ই।'

'অত টাকা পাবে কোথায়? লটারির ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছ নাকি?'

'তা একরকম বলতে পার।'

একটু চুপ করে থেকে কৃষ্ণকিশোর এতক্ষণের রহস্যের ওপর থেকে পর্দাটি তুললেন, 'আজ আমাদের অফিস থেকে এমপ্লয়ীদের সমস্ত বকেয়া পাওনা ইন্টারেস্ট সুদ্ধু কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়েছে।'

কৃষ্ণকিশোরের বাবা নন্দকিশোর খাস ইংরেজ কোম্পানিতে কাজ করতেন। ছেলেকে তিনি সেখানেই ঢুকিয়ে দিয়ে যান। স্বাধীনতার পর কয়েক বছর সাহেবরাই ছিল মালিক। পরে মারোয়াড়ি বিজনেসম্যানদের হাতে কোম্পানি বেচে দিয়ে তারা ইংলন্ডে পাড়ি জমায়। ব্রিটিশরা যতদিন ছিল কোনওরকম ঝঞ্ঝাট হয় নি। এক'শ বছরের কোম্পানি মসৃণ নিয়মে কারবার চালিয়ে গেছে। মাড়োয়ারিদের হাতে পড়ার পর থেকেই যত গোলমালের সূত্রপাত। নতুন মালিকদের একমাত্র লক্ষ্য লোক ছাঁটাই করে বাকি এমপ্লয়ীদের নাকে দড়ি দিয়ে খাটানো। সেই সঙ্গে ক্রমাগত প্রফিট বাড়ানো। এই নিয়ে ইউনিয়নের সঙ্গে প্রচণ্ড খটাখটি। মাঝে মাঝেই কর্মবিরতি। দু-এক বছর পর পর লম্বা স্ট্রাইক। তীব্র অশান্তির মধ্যে কোম্পানি হাতবদল হয়ে গেল। এবার মালিক এক গুজরাতি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। বছর কয়েক চলার পর ফের ঝঞ্ঝাট। ফের ধর্মঘট। ফের রিলে অনশন। এরই মধ্যে আবার

কোম্পানির মালিকানা বদলে গেল। এইভাবে সাত আটবার হাত ফেরতা হবার পর একানব্বইতে অফিসে পাকাপাকি তালা পড়ে গেল। তারপর কত আন্দোলন, কত মিছিল, কত স্লোগান, কত ধরনা, সরকারি শ্রম দপ্তরে কত ডেপুটেশন। মালিকপক্ষের দ্বিপাক্ষিক ত্রিপাক্ষিক কত আলোচনা। কিন্তু অফিসের তালা আর খুলল না।

কৃষ্ণকিশোরের রিটায়ারমেন্ট হয়ে গিয়েছিল। সরকারি নানা দপ্তরে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কাছে ঘুরে ঘুরে কয়েক জোড়া চটি আর পায়ের তলা খইয়ে ফেলেও কাজের কাজ কিছুই হল না। একটা ঘষা পয়সাও আদায় করা গেল না।

হতাশার শেষ সীমায় যখন কৃষ্ণকিশোর পৌঁছে গেলেন সেই সময় ঘন আঁধারে আলোর একটু সংকেত দেখা দিল। মাস দুই আগে আবার কোম্পানি হস্তান্তর হয়ে গেল। নতুন মালিক আগেকার সমস্ত দায় নিতে প্রস্তুত। পুরনো সব বকেয়া মিটিয়ে দিয়ে তিনি কোম্পানি চালু করবেন।

বাড়িতে এ-সব খবর কাউকে জানান নি কৃষ্ণকিশোর। কেন না আগে অনেকবার আশার কথা শুনিয়েছেন। পরে শুষ্ক, মলিন মুখে বলতে হয়েছে, 'কিচ্ছু হল না।'

দু'মাস ঘোরাঘুরির পর তাঁর যাবতীয় প্রাপ্য আজ পেয়ে গেছেন কৃষ্ণকিশোর। ব্যাঙ্কে চেক জমা দেওয়া হয়েছে। দু-তিন দিনের ভেতর তাঁর অ্যাকাউন্টে টাকাটা এসে যাবে। ব্যাঙ্কে অল্প স্বল্প যা পড়ে ছিল তার থেকে সাত শো টাকা তুলে আজ বাজার করে এনেছেন।

খাবার ঘরে তড়িত প্রবাহ খেলে গেল। বিহ্বলের মতো তাকিয়েই আছে সুতপারা। কী বলবে, ভেবে পাচ্ছে না।

স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের মুখগুলোর ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে চোখদুটো ঘুরিয়ে নিতে নিতে কৃষ্ণকিশোর জিজ্ঞেস করলেন, 'সুদ-আসল মিলিয়ে কত টাকা পেয়েছি, জানো?'

একসঙ্গে রুদ্ধশ্বাসে সবাই জিজ্ঞেস করে, 'কত?'

'চোদ্দ লক্ষ সাতাত্তর হাজার আট শো।'

এবার কেউ আর একটি কথাও বলল না। অফিস থেকে কিছু টাকা পাওয়া যাবে, এটাই সকলে জানত। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ অর্থ তারা কল্পনাও করে নি। ব্যাপারটা অলৌকিক স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। শুনেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

কৃষ্ণকিশোরের ভাঙাচোরা মুখ, নিষ্প্রভ চোখ থেকে আশ্চর্য এক আলো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। বয়েসের তুলনায় বড় বেশি বুড়িয়ে-যাওয়া, নুয়ে-পড়া মানুষটাকে আজ কী সতেজ এবং পরিতৃপ্তই না দেখাচ্ছে!

কৃষ্ণকিশোর ছেলেমেয়েদের লক্ষ করে বলতে লাগলেন, 'মাঝখানে ক'টা বছর

কী কষ্টে যে কাটিয়েছি! ভিখিরিরও অধম। কতদিন পেট ভরে তোদের খাওয়াতে পারিনি। তোদের মা ভুগে ভুগে শেষ হয়ে যেতে বসেছে। ওর কষ্ট দেখে মরে যেতে ইচ্ছে করেছে। অক্ষম বাপ, অক্ষম স্বামী।' গলা বুজে এসেছিল তাঁর। সেটা সাফ করে নিয়ে উদ্দীপ্ত সুরে এবার বললেন, 'ফরগেট দা পাস্ট। ঈশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন। এখন যার যার সাধ মিটিয়ে নাও। লাস্ট লাইফটা ভালভাবে কাটলেই শান্তি। না কি বলিস?'

ছেলেমেয়েরা উত্তর দেবার আগেই রাজেশ্বরী বলে ওঠেন, 'এমন একটা সুখবর! মন্টু, সন্তু আর বড় খুকিকে জানাবে না?'

মন্টু, সন্তু এবং বড় খুকি, যাদের স্কুল-কলেজের নাম পরিমল, সুভাষ আর দীপালি, কৃষ্ণকিশোর আর রাজেশ্বরীর অন্য তিন ছেলেমেয়ে। তারা চেতলার এই বাড়িতে থাকে না। তাদের কথা পরে।

শীর্ণ মুখের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে কৃষ্ণকিশোরের। চশমার ভেতর ঘোলাটে চোখদু'টো জ্বলতে থাকে। করাতের মতো কর্কশ গলায় তিনি বলেন, 'না। ওদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।'

চার

খাওয়া-দাওয়া মিটতে মিটতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। তারপর ছেলেমেয়েরা রাজেশ্বরীকে ধরে ধরে তেতলায় তাঁর শোবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে দোতলায় যে যার ঘরে চলে আসে। কৃষ্ণকিশোরও ওদের সঙ্গে তেতলায় উঠে এসেছিলেন।

সেই সকাল বেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে 'লাহিড়ী'স লেজার গ্রাফিকস'-এ গিয়ে একটানা কয়েক ঘন্টা কাজ করেছে সুতপা। তারপর আচমকা কৃষ্ণকিশোরের ফোন। তখন থেকে একের পর এক যা ঘটে গেছে তার ঘোর এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি সে। অন্য দিন শরীর এত ক্লান্ত থাকে যে কাজ থেকে ফিরে কোনওরকমে ডাল তরকারি দিয়ে দু'খানা রুটি চিবিয়েই শুয়ে পড়ে সুতপা। সারা রাত মড়ার মতো ঘুমিয়ে পরদিন আবার 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস'-এ ছোটা। সন্ধেয় ফেরা : রোজ এক রুটিন। একঘেয়ে। ক্লান্তিকর।

আজ কিন্তু ঘুম আসছে না। ঘরের দরজায় ভেতর থেকে খিল আটকে খানিকক্ষণ বিছানায় চুপচাপ বসে থাকে সুতপা। তারপর উঠে উত্তরের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এদিকটা তাদের বাড়ির পেছনের অংশ। ভাঙা বাউন্ডারি ওয়াল পর্যন্ত অকেজো গাছপালা ঝোপঝাড়ে বোঝাই। তারপর খানিকটা এবড়ো খেবড়ো ফাঁকা জমির পর খোয়ার রাস্তা। রাস্তার ওপারে খোলার চালের চাপ-বাঁধা বস্তি।

বস্তিটা যেখানে শেষ, সেখান থেকে পর পর ক'টা হাইরাইজ। ঝকঝকে নতুন। সেগুলো মহাশূন্যে মাথা তুলে আকাশকে ছুঁতে চাইছে।

সদাব্যস্ত এই মহানগরও এই মধ্যরাতে একেবারে নিঝুম। তার উত্তাল কলরোল থেমে গেছে। ক্বচিৎ দু-একটা গাড়ি বা ট্রাক দূরের কোনও রাস্তা দিয়ে ঝড় তুলে ছুটে যাচ্ছে।

এটা বুঝিবা শুক্লপক্ষ। আকাশে পূর্ণ চাঁদের মায়া। কারা সব অদৃশ্য সব কলসি উপুড় করে ঢেলে চলেছে গলানো রুপো। অবিরল। খানাখন্দে ভরা রাস্তা, যেখানে সেখানে আবর্জনার পাহাড়, দুর্গন্ধ, ভিড়, ঘাম, ধুলো—সব মিলিয়ে দিনের বেলার কুৎসিত, জীর্ণ শহরটাকে এখন আর চেনাই যায় না। কী আশ্চর্য সুন্দর যে লাগছে!

একসময় বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল সুতপা। খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলোর ঢল নেমেছে ঘরের ভেতরেও।

চকিতে মনে পড়ল, দীপঙ্করকে ফোন করার কথা ছিল তার। কৃষ্ণকিশোর কেন তাকে গাড়িয়াহাটে দেখা করতে বলেছিলেন, জানার জন্য ভীষণ উৎকণ্ঠায় আছে দীপঙ্কর। সুতপাদের বাড়িতে তো টেলিফোন নেই। এত রাতে দীপঙ্করকে ধরাও যাবে না। কৃষ্ণকিশোর যা সব ম্যাজিক দেখিয়েছেন তাতে ওর কথা একেবারেই মনে ছিল না। কাল সকালে সুতপার প্রথম কাজ হবে নরেশ আড্ডি রোডের মোড়ে 'লোকনাথ মেডিক্যাল স্টোর্স'-এ গিয়ে দীপঙ্করকে ফোন করা। পয়সা দিলে ওরা ফোন করতে দেয়।

দীপঙ্করের চিন্তাটা পলকের জন্য দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। আজ বাবা মা ভাইবোন, নিজেদের ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছে না সুতপা।

তারা সবসুদ্ধ ছয় ভাই বোন। প্রথমে দুই দাদা। তারপর তিন বোন। সবার শেষে আরেক ভাই।

সাহেব কোম্পানিতে ভালই চাকরি করতেন কৃষ্ণকিশোর। মাসের শেষে যা মাইনে পেতেন তাতে রাজার হালে না হলেও মোটামুটি সচ্ছলভাবেই কেটে যাবার কথা। কিন্তু এতগুলো ছেলেমেয়ে, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। সংসার তো আর ছোট নয়। আটটি মানুষের খাওয়ার খরচ, জামাকাপড়, লোক-লৌকিকতা, কর্পোরেশনের ট্যাক্স, ইলেকট্রিক বিল, অসুখবিসুখ—এ-সব তো আছেই। তার ওপর ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা। স্কুল কলেজের মাইনে, টিফিন, পরীক্ষার ফীজ। খরচের কি শেষ আছে? প্রায় কিছুই জমাতে পারেননি কৃষ্ণকিশোর। সঞ্চয়ের ঘর একরকম ফাঁকাই। শুধু খাওয়ালে পরালে বা লেখাপড়া শেখালেই তো চলবে না। ঘাড়ের ওপর তিন তিনটে মেয়ে রয়েছে। তাদের বিয়ে দিতে হবে। মুখের কথায় তো মেয়ে পার করা যায় না। সে জন্য প্রচুর টাকা চাই। অপার দুর্ভাবনার মধ্যে আলোর একটা

সংকেত কৃষ্ণকিশোর অবশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর বড় আর মেজ ছেলে, পরিমল এবং সুভাষ, লেখাপড়ায় দুর্দান্ত। বরাবর তারা চোখধাঁধানো রেজাল্ট করে এসেছে। এই দুই ছেলেকে নিয়ে ফাটকা খেলেছিলেন কৃষ্ণকিশোর। তাদের নাম-করা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িয়েছেন। তিন-চার জন করে প্রাইভেট টিউটর দিয়েছেন। তাদের খাওয়া-দাওয়া; পোশাক-আশাকের আলাদা ব্যবস্থা। এদের খরচ যোগাতে বহু টাকা ধার করতে হত। ঋণশোধ করতে জিভ বেরিয়ে যেত কৃষ্ণকিশোরের। কড়ার করে টাকা নিয়ে সময়মতো ফেরত দিতে না পারায় কত বার তাঁকে হেনস্তা হতে হয়েছে তার ঠিক নেই। মুখ বুজে তিনি সব সয়ে গেছেন।

দুই ছেলে ছাড়া অন্য সন্তানদের দিকে সেভাবে লক্ষই করেন নি কৃষ্ণকিশোর। তারা পড়াশোনায় মাঝারি। খুব সাধারণ স্কুল বা কলেজে ওদের পড়িয়েছেন। তাদের জন্য না প্রাইভেট টিউটর, না দামি জামাকাপড়। দুই দাদার পাশে তারা অবহেলায় প্রায় আগাছার মতো বেড়ে উঠেছে।

পরিমল আর সুভাষের 'স্পেশাল' ব্যবস্থার কারণ একটাই। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বেরিয়ে তারা বিরাট কোম্পানিতে বড় চাকরি পাবে। মাসের শেষে বিপুল অঙ্কের মাইনে নিয়ে বাড়ি ফিরবে। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব নেবে তারা। বোনেদের বিয়ে দেবে। বাড়ির চেহারা ফিরে যাবে। অবসান ঘটবে কৃষ্ণকিশোরের যাবতীয় দুর্ভাবনার। চিন্তামুক্ত ফুরফুরে মেজাজে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবেন তিনি।

ভবিষ্যতের কথা ভেবে আটঘাট বেঁধে দারুণ একখানা ছক কষেছিলেন কৃষ্ণকিশোর। ভেবেছিলেন, এতেই বাজিমাত করে দিতে পারবেন। কিন্তু বজ্র আঁটুনির ভেতর কোথায় একটা ফস্কা গেরো থেকে গিয়েছিল। তাঁর এমন নিখুঁত পরিকল্পনা বানচাল করে দিল দুই ছেলেই। প্রথমে পরিমল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্যাম্পাসে ইন্টারভিউ দিয়ে বিশাল মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরিও পেয়ে গেল। তলায় তলায় সে যে চুটিয়ে প্রেম করছিল, ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া যায় নি। চাকরি পাওয়ার মাস ছয়েকের ভেতর রেজিস্ট্রি করে বিয়ে। প্রেমিকা বউ হয়ে 'মহামায়া ধামে'-এ পা রাখল। এবাড়ির কোনও কিছুই তার পছন্দ নয়। কারও সঙ্গে সেভাবে মিশত না। সব সময় আলগা আলগা ভাব। কথাবার্তা বলত খুব কম। আকাশের দিকে নাক তুলে থাকত। তার স্বামীর পয়সায় গোষ্ঠীসুদ্ধ খাবে পরবে, এটা আদৌ মনঃপূত নয়। আদ্যোপান্ত স্বার্থপর। কুচুটে। আত্মকেন্দ্রিক।

মাসকয়েক 'মহামায়া ধামে'-এ কাটিয়ে বউ নিয়ে একদিন লেক গার্ডেনসে বাড়ি ভাড়া করে চলে গেল।

দুই ছেলেকে নিয়ে যে স্বপ্নের ইমারত কৃষ্ণকিশোর মনে মনে তৈরি করে রেখেছিলেন তার ভিতের একটা দিক ধসে গেল। তবু আশায় আশায় রইলেন তিনি। কেন না তখনও সুভাষ রয়েছে।

দ্বিতীয় ছেলের বেলাতেও অন্যরকম কিছু ঘটল না। তিন বছর বাদে চাকরি পেয়ে পরিমলের দেখানো পথেই পা ফেলে চলে গেল সুভাষ। পরিমল তবু বউ নিয়ে কয়েক মাস 'মহামায়া ধাম'-এ থেকে গেছে। রেজিস্ট্রি ম্যারেজের পর মাত্র একবারই বউ নিয়ে মা-বাবা এবং ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে দেখা করে একটা রাত কাটিয়ে পরদিন চলে গিয়েছিল সুভাষ। ওরা বাড়ি ভাড়া করেছিল কাঁকুলিয়ায়। পরিমলের মতো সুভাষের সঙ্গেও সুতপাদের সম্পর্কের সুতোটা পট করে ছিঁড়ে গেল। কৃষ্ণকিশোরের স্বপ্নের মিনারের যেটুকু বাকি ছিল, লহমায় তাও ধূলিসাৎ।

এর মধ্যে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তুলে, বাইরে থেকে ধার দেনা করে বড় মেয়ে দীপালির বিয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণকিশোর। দীপালির মতো অবুঝ, একগুঁয়ে, লোভী মেয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে খুব বেশি নেই। বাবা যে দুই ছেলের পেছনে টাকা ঢেলে, তার বিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত, ঋণে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে, তা নিয়ে সে ভাবে না। মা-বাবা ছোট ভাইবোনদের প্রতি দয়ামায়া নেই। বিবেচনাহীন, নিষ্ঠুর। জামাই ষষ্ঠী ঘটা করে করতে হবে। ছেলেমেয়েদের জন্মদিনে সোনার গয়না দিতে হবে। তা ছাড়া পুজোয়, নতুন বছরে দামি দামি জামাকাপড় চাই। দশ হাত বাড়িয়ে শুধু দাও—দাও—দাও।

কৃষ্ণকিশোরের নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। তবু যতদিন পেরেছেন, দীপালির দাবি যতটা পেরেছেন মিটিয়ে গেছেন।

এদিকে মেজ মেয়ে নমিতা দুম করে পালিয়ে গিয়ে একটা বিয়ে করে বসল। ছেলেটা মেকানিকের কাজ মোটামুটি জানে। বিকল স্টোভ, ইস্তিরি, হিটার সারায়। তাতে আর ক'পয়সা পায়। স্বামী যদি রোজগেরে না হয়, শ্বশুর বাড়িতে স্ত্রীর যা হাল হয় তাই হয়েছিল নমিতার। একসঙ্গে ঝি এবং রাঁধুনির কাজ করতে হ'ত তাকে। সামান্য মর্যাদাটুকুও ছিল না। উঠতে বসতে গালিগালাজ, গঞ্জনা। বাপের বাড়ি থেকে টাকা গয়না নিয়ে আসার জন্য ক্রমাগত চাপ।

অতিষ্ঠ, বিপর্যস্ত নমিতা শেষ পর্যন্ত 'মহামায়া ধাম'-এ ফিরে এসেছিল। আদালত অব্দি গড়িয়েও বিয়েটা এখনও কাটান ছাড়ান হয় নি। শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্কও নেই। ওর স্বামী বিমল এ-বাড়িতে কখনও আসে না। কোন মুখেই বা আসবে?

চারদিকের হাল যখন এমন ঘোরালো, বেড়াজালের মতো হাজার সমস্যা যখন কৃষ্ণকিশোরকে ঘিরে ধরেছে, অদৃশ্য সাঁড়াশির চাপে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসার যোগাড়,

সেই সময় আচমকা তাঁদের কোম্পানি ‘ক্লোজার’-এর নোটিস টাঙিয়ে দিল। বেশ কিছুদিন ধরেই ইউনিয়নের সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের গণ্ডগোল চলছিল। তার পরিণতি এই ‘ক্লোজার’।

কৃষ্ণকিশোরের চোখের সামনে তখন চাপ চাপ অন্ধকার। তাঁর মনে হয়েছিল, হাত-পা বেঁধে কেউ যেন তাঁকে মাঝ-সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে।

অফিস বন্ধ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজেশ্বরীর স্ট্রোক হয়ে গেল। যেটুকু গয়নাগাটি অবশিষ্ট ছিল তা বেচে চলল চিকিৎসা। ডাক্তারের ফীজ, ওষুধের দাম, সব মিলিয়ে খরচ কি সামান্য!

পারিবারিক বাজেটে কাটছাঁট চলতে লাগল অবিরত। মাছ মাংস বাদ। মাসে চার কিলো তেলের জায়গায় আসতে লাগল আড়াই কিলো। ঘি-মাখন বন্ধ, দই সন্দেশ বন্ধ। আগে যা দুধ আসত, কমিয়ে তা অর্ধেক করা হল। মোটা চালের ভাত, সস্তা আটার রুটি, ঝড়তি পড়তি আনাজ, এই দিয়ে কোনওরকমে বেঁচে থাকা।

সুতপা তখন হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে বি. এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। দাদাদের মতো নাম করা স্কুল কলেজে তাকে পড়াতে পারেন নি কৃষ্ণকিশোর। গন্ডাখানেক প্রাইভেট টিউটরও দেওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু ছাত্রী সে খারাপ ছিল না। নিজের জেদ এবং এনার্জির জোরে ভাল রেজাল্টই করেছিল। ছোট ভাই নান্টু খুব সাধারণ একটা স্কুলে নিচু ক্লাসে পড়ছে।

হতাশ, দিশেহারা কৃষ্ণকিশোর দুই ছেলের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। পরিমল আর সুভাষ, দু'জনেই জানিয়ে দিয়েছিল, মাইনে তারা খারাপ পায় না ঠিকই কিন্তু অনেক খরচ। বাড়িভাড়া দিতে হয় প্রচুর। এর মধ্যে তাদের ছেলেমেয়েও হয়ে গেছে। তারা পড়ে দামি স্কুলে। সেখানে টুইশন ফি বিরাট অঙ্কের। রাতদিনের কাজের লোক রয়েছে। স্ট্যাটাস বজায় রাখতে মাঝে মাঝে পার্টি দিতে হয়। এত সবের পর হাতে প্রায় কিছুই থাকে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুই ছেলের কাছ থেকেই খালি হাতে ফিরে আসতে হয়েছিল কৃষ্ণকিশোরকে। খরচ আরও কত কমানো যায় তাই নিয়ে চলতে লাগল চুলচেরা হিসেব।

কৃষ্ণকিশোর ঠিক করে ফেললেন, নান্টু আর সুতপার পড়া বন্ধ করে দেবেন। তাতে কিছু টাকা বেঁচে যাবে। এইবার তুমুল আপত্তি জানালো সুতপা।

বিমর্ষ মুখে কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'সংসারের হাল তো জানিস। তোদের স্কুল-কলেজের মাইনে কোত্থেকে দেব?'

অসহায় মানুষটাকে দেখে ভীষণ মায়া হয়েছিল সুতপার। সে বলেছে, 'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমরা যাতে পড়াটা চালিয়ে যেতে পারি তার ব্যবস্থা আমি করব।'

অবাক কৃষ্ণকিশোর জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী ব্যবস্থা করবি?'

সুতপা উত্তর দেয় নি। তবে সেই মাস থেকেই পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে সকালে বিকেলে এবং সন্ধেয় প্রাইভেট টিউশনি করে গেছে। এইভাবে ক'বছরে সে বি. এ পাস করল, নান্টুও হায়ার সেকেন্ডারির গন্ডি পেরোল। কিন্তু তার পড়া আর এগলো না। ওর মাথায় তখন চরম হতাশা চেপে বসেছে। নান্টুর ধারণা, বি. এ এম. এ পাস করে চাকরি বাকরি কিছুই মিলবে না। শুধু শুধু সময় আর এনার্জি নষ্ট। কিছুদিন কলেজে যাতায়াত করে পড়া ছেড়ে দিল সে। মোড়ের 'গণেশ কেবিন'-এর আড্ডায় একজন স্থায়ী মেম্বার হয়ে জাঁকিয়ে বসল।

টুইশনি করে শুধু পড়ার খরচ চালানোই তো নয়, সংসার চালানোর জন্য বাবার হাতেও কিছু টাকা তুলে দিতে হতো। ছোট ভাইটা কলেজ ছেড়ে দেওয়ায় মন খারাপ হলেও কিছুটা স্বস্তি যে হয় নি, জোর করে তা বলতে পারবে না সুতপা। আসলে সে আর পেরে উঠছিল না।

এদিকে বড় মেজ দুই ছেলের কাছ থেকে হতাশ হয়ে পড়ার পর একবার মোহ্যমান হয়ে পড়ছিলেন কৃষ্ণকিশোর। সুতপাকে দিবারাত্রি খাটতে দেখে তাঁর মধ্যেও কিছুটা উদ্দীপনা যেন চারিয়ে গেল। হাত-পা গুটিয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে পড়ে মার খাওয়ার মানে হয় না। ঘুরে দাঁড়াবার একটা চেষ্টা করে দেখা যাক না। অ্যাকাউন্টসের কাজ জানতেন তিনি। একে ওকে ধরে বড়বাজারে মাড়োয়ারিদের অফিসে হিসেব লেখার চাকরি জোটাতে পেরেছিলেন। তাতে আর ক'টা পয়সা আসে! নাকেমুখে রক্ত তুলে, উদয়াস্ত খেটে হাজার আড়াইয়ের মতো। তার সঙ্গে সুতপার টুইশনির কিছু টাকা। এই সামান্য আয়ে সংসার আর চলতে চাইছিল না। মনে হচ্ছিল, যে কোনও মুহূর্তে মুখ থুবড়ে পড়বে।

এই চরম দুঃসময়ে, হাজারটা সংকট যখন হাঁ-মুখ মেলে চারদিক থেকে ধাওয়া করে আসছে, হঠাৎই দীপঙ্করের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল সুতপার। তার কলেজের এক বন্ধু মাধবীর সেদিন বিয়ে। বিয়ের আসরেই দু'জনের দেখা। দীপঙ্কর মাধবীর মাসুততো দাদা। দারুণ আমুদে। প্রচণ্ড হুল্লোড়বাজ। একাই বিয়েবাড়ি মাতিয়ে রেখেছিল।

মাধবীই তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। পরস্পরকে দু'জনের ভালও লেগে যায়। আলাপটা বিয়ে বাড়িতেই শেষ হয়ে যায় না। পরেও সেটার রেশ চলতে থাকে।

মাধবী কখনও দীপঙ্করদের বাড়ি যায় নি। দীপঙ্কর একবারই মাত্র তাদের নরেশ আড্ডি রোডের 'মহামায়া ধাম'-এ এসেছিল। তাদের দেখা টেখা, মেলামেশা, সবই বাইরে বাইরে। আগে থেকে সময় এবং জায়গা ঠিক করে নিয়ে।

দীপঙ্করদের বাড়ি না গেলেও তাদের নাড়িনক্ষত্রের সব খবরই জেনে গেছে সুতপা। তাদের মতোই খুব সাদামাঠা মধ্যবিত্ত পরিবার। রিটায়ার্ড কেরানি বাবা, মা, এক বিধবা দিদি, দুই নাবালক ভাগনে, কলেজে পড়া ছোট ভাই আর দীপঙ্কর নিজে। এই নিয়ে ওদের মোটামুটি বড় মাপের সংসার। মামা কি মেসো কি মেসো মন্ত্রী, এম. পি, এম. এল. এ. বা বড় কোম্পানির চেয়ারম্যান কিংবা জবরদস্ত রাজনৈতিক নেতা নয়। অর্থাৎ তেমন কোনও মজবুত খুঁটি নেই যার জোরে ভাল এবং মজবুত একটা চাকরি জুটতে পারে। তাই এম. এ'তে হাই সেকেন্ড ক্লাস পেয়েও অ্যাড এজেন্সিতে পার্ট টাইম কাজ, টিউটোরিয়ালে ক্লাস পিছু কিছু টাকা, বাবার যৎসামান্য পেনশন, এই সব জোড়াতোড়া দিয়ে কোনওরকমে টিকিস টিকিস করে চলছে। দূর দিগন্তে আলোর কোনও রেখা নেই, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় ভরা, কিন্তু কোনও কিছুই পরোয়া করে না দীপঙ্কর। ঘোর অভাব, হতাশা, ব্যর্থতা—তুড়ি মেরে এ-সব উড়িয়ে দেবার মতো আশ্চর্য এক অহমিকা, প্রবল মনের জোর তার আছে। পকেটে টাকা থাকলেও সে হাসে, না থাকলেও হাসে। সারাক্ষণ তার মুখে অফুরান হাসি। মানুষটা মজা টজা করতে ভালবাসে। তবে ছল চাতুরির ধারেকাছে নেই। মন কাচের মতো স্বচ্ছ।

সব চেয়ে বড় ব্যাপার, দীপঙ্কর চূড়ান্ত আশাবাদী। কখনও হতাশ হয় না। কখনও ভেঙে পড়ে না। হাজার সংকটেও মুখ থেকে হাসি মুছে যায় না। তার সঙ্গে কথা বললে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। মনে হয় ভাল কিছু ঘটবে। অন্ধকার কেটে যাবে। সুদিন দূরে নেই।

সংসারের যা হাল তাতে সুতপার মনে হত, ক্রমশ তারা তলিয়ে যাচ্ছে। মানুষের মতো বেঁচে থাকার কোনও পথই তাদের সামনে খোলা নেই। দীপঙ্কর তাকে নৈরাশ্যের চাপে খান খান হয়ে যেতে দেয় নি। বরং তার ম্রিয়মাণ আশাকে অবিরাম উসকে দিয়ে দিয়ে সতেজ রেখেছে।

বি. এ'র পর আর পড়ার ইচ্ছা ছিল না। দীপঙ্করই তাড়া দিয়ে দিয়ে তাকে প্রাইভেটে এম.এ পরীক্ষায় বসিয়েছে। পাশও করে গেছে সে। কিন্তু আজকাল শুধু ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিতে কাজ হয় না। অন্য কোয়ালিফিকেশনও দরকার। দীপঙ্করই তার জানাশোনা একটা কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারে সুতপাকে ভর্তি করে দিয়েছিল। পড়াশোনা টিউশনির ফাঁকে ফাঁকে ডি.টি.পি'তে ছ'মাসের একটা কোর্স করেছে সে। শুধু তাই নয়, যাতে তার একটা চাকরি জুটে যায় সেজন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে গেছে। শেষ পর্যন্ত একে ওকে ধরে 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস'-এ কাজটা জুটিয়ে দিয়েছিল। মাসের শেষে ধরাবাঁধা মাইনে নয়, যতটা কম্পোজ সে করতে পারবে, হিসেব করে সেইমতো মজুরি চুকিয়ে দেওয়া হয়। যেমন কাজ তেমন পয়সা। মাসে

সাড়ে তিন থেকে চার হাজারের মতো হাতে আসে। এই কাজটা পাওয়ায় হাঁফ ছাড়তে পেরেছিল তারা।

সুতপার মনে আছে, 'লাহিড়ীস লেজার গ্রাফিকস'-এর কাজের খবরটা নিয়ে তাদের নরেশ আড্ডি রোডের বাড়িতে ছুটে এসেছিল দীপঙ্কর। দারুণ খুশি। সারা মুখে বিপুল উত্তেজনা। চোখ চকচক করছে। কাজটা যেন সে-ই পেয়েছে।

আগে থেকে জানান না দিয়ে হুট করে বাড়িতে চলে আসায় সুতপা যত না হকচকিয়ে গেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি জড়সড় হয়ে পড়েছে। তবু তার মধ্যে তাকে বাইরের ঘরে বসাতে হয়েছিল। বাবা, ছোটদি এবং নান্টুর সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিতে হয়েছিল। এমন কি তেতলার ঘর থেকে ধীরে ধীরে অসুস্থ মাকে নামিয়ে এনেছিল নান্টু।

তার বন্ধু মাধবীর মাসতুতো দাদা জানার পরও দীপঙ্কর সম্পর্কে মা বাবা ভাইবোনদের যতটা কৌতূহল তার চেয়ে ঢের বেশি সংশয়। সুতপাকে রোজই বাইরে বেরোতে হয়। স্বাভাবিক কারণেই অনেকের সঙ্গে আলাপ টালাপ থাকতে পারে। কিন্তু সেটা গোপনে কতটা শেকড়-বাকড় ছড়ালে একটি অনাত্মীয় যুবক কোনও মেয়ের বাড়িতে হাজির হতে পারে, সেটাই সবাই আঁচ করতে চাইছিল। বিশেষ করে কৃষ্ণকিশোর। শত্রুপক্ষের ঝানু উকিলের মতো দীপঙ্কর কী করে, কোথায় থাকে, বাড়িতে কে কে আছে, ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। একটানা সওয়াল-জবাবের মধ্যে সুকৌশলে বুঝে নিতে চাইছিলেন, সুতপার সঙ্গে এই উটকো যুবকটির সম্পর্কটা ঠিক কী এবং কতটা গভীর।

সুতপার ঘাড় নুয়ে পড়েছিল। তারই মধ্যে লক্ষ করছিল, দীপঙ্করের চোখমুখ থেকে হাসি যেন কুলকুল করে উপচে পড়তে চাইছে। কৃষ্ণকিশোরের এত সব চুলচেরা কূট প্রশ্নের আড়ালে কী লুকনো রয়েছে, সেটা তার কাছে ধরা পড়ে গেছে। ভীষণ মজা পাচ্ছিল দীপঙ্কর।

আর নতমস্তকে বসে দীপঙ্করকে দেখতে দেখতে সুতপা ঘেমে উঠছিল। ও যা ছেলে, দুম করে হয়ত বলে বসবে, 'আপনার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করি মশাই।' কিন্তু না, অতটা বাড়াবাড়ি করে নি দীপঙ্কর। বলেছিল, 'একটা খবর নিয়ে এসেছি। লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস'-এর নামটা জানিয়ে বলেছে, 'আজই সেখানে জয়েন করতে হবে আপনার মেয়েকে।'

'মহামায়া ধাম'-এ বহুকাল কোনও সুসংবাদ আসেনি। যা এসেছে সবই খারাপ খবর। সারা বাড়ির ওপর দিয়ে হঠাৎ উতল হাওয়া বয়ে গিয়েছিল। দীপঙ্কর সম্পর্কে সব সন্দেহের অবসান। মা বাবা ভাইবোনদের মনে যে কুয়াশা জমেছিল, লহমায় তা উধাও।

কৃষ্ণকিশোর কতকাল যে এত খুশি হন নি। তাঁর ভাঙাচোরা, রুক্ষ মুখে আলোর ঝলক খেলে গিয়েছিল। ভীষণ ব্যস্তভাবে নান্টুকে 'নকুল মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এ পাঠিয়ে লবঙ্গলতিকা আর কাঁচাগোল্লা আনিয়েছিলেন। নমিতাকে রান্নাঘরে পাঠিয়ে চা করিয়েছেন।

কোনও রকম সঙ্কোচ নেই দীপঙ্করের। উৎকৃষ্ট মিষ্টিগুলো সে খেয়েছিল বেশ আয়েস করে। তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলেছে, 'অফারটা যখন এসেই গেছে, দেরি করা ঠিক হবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজে জয়েন করা দরকার।'

তক্ষুনি সায় দিয়েছিলেন কৃষ্ণকিশোর, 'নিশ্চয়ই। দেরি করলে শুভকাজে বাধা পড়ে যায়।'

দীপঙ্কর বলেছে, 'সুতপা তো অফিসটা চেনে না। এমপ্লয়ারের সঙ্গেও পরিচয় নেই। আমার সঙ্গে এখন যদি যায়, আলাপটা করিয়ে দিতাম। আপনাদের আপত্তি নেই তো?'

দীপঙ্কর কাজের ব্যবস্থা করেছে। বাড়তি কিছু টাকার মুখ দেখা যাবে। যে-সংসারে অনটন লেগেই আছে, নুন আনতে পানতা ফুরোয়, সেখানে খানিকটা হলেও স্বস্তি মিলবে। কৃষ্ণকিশোর ব্যস্তভাবে হাত নাড়তে নাড়তে বলেছিলেন, 'কিসের আপত্তি?' সুতপাকে তাড়া দিয়েছিলেন, 'ছোট খুকি, যা জামাকাপড় পালটে আয়।'

সেদিন দীপঙ্করের সঙ্গে 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস'-এ গিয়ে মালিক প্রদোষ লাহিড়ীর সঙ্গে আলাপ তো হয়েছিলই, কাজের শর্ত সম্বন্ধেও খুঁটিনাটি আলোচনা হয়েছে। পরদিনই জয়েন করতে হবে সুতপাকে। কখন আসতে হবে, কখন ছুটি, মাসের শেষে কোন তারিখে পেমেন্ট পাওয়া যাবে, সমস্ত জানিয়ে দিয়েছিলেন প্রদোষ।

কথাবার্তা যা বলার সবই বলেছে দীপঙ্কর। নীরব শ্রোতা হয়ে পাশে বসে থেকেছে সুতপা।

'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস' থেকে বেরিয়ে বাসে এসপ্ল্যানেডে এসেছিল তারা। মনে আছে, সেটা ছিল সেপ্টেম্বরের শেষের দিক। বাংলা ক্যালেন্ডারে আশ্বিন মাস। কলকাতার আকাশ এমনিতে ধোঁয়ায় ধুলোয় মলিন হয়ে থাকে। সেই আশ্বিনে ঝকঝক করছিল। মনে হচ্ছিল, মহানগরের মাথার ওপর কেউ যেন পরমাশ্চর্য নীল চাঁদোয়া টাঙিয়ে দিয়েছে। এ-কোণে ও-কোণে স্ফটিকের স্তূপের মতো সাদা মেঘ হাওয়ায় হাওয়ায় লঘু মেজাজে ভেসে বেড়াচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, গলানো গিনির মতো মায়াবী রোদের ঢল নেমেছে সমস্ত শহর ভাসিয়ে দিয়ে। পশ্চিম দিকে মনুমেন্টের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি।

সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে, যে-ধারেই তাকানো যাক, শুধু মানুষ আর মানুষ। ভিড়ে ভিড়াক্কার। খানখন্দে ভরা রাস্তা। ফুটপাথগুলো হকারদের দখলে। তুমুল জমজমাট। ফাঁদে আটকা পড়া জন্তুর মতো অগুনতি বাস ট্রাম জিপ ভ্যান প্রাইভেট কার হাঁসফাঁস করছে। হর্ন দিয়ে চলেছে কিংবা ঘন্টি বাজাচ্ছে অনবরত। গোটা চত্বর জুড়ে তীব্র পাঁচমেশালি আওয়াজ। যানবাহনের, মানুষের কলরোলের।

এই দৃশ্য প্রতিদিনের। এত সব কর্কশ শব্দে রোজই কান ঝালাপালা হয়। কোথাও এতটুকু হেরফের নেই। তবু পুরনো, জীর্ণ, বিশৃঙ্খল শহরটাকে কী ভালই যে লাগছিল সেদিন! কী আশ্চর্য মায়াময়! এক স্বপ্নের ভূমণ্ডলে যেন এসে পড়েছে সুতপা।

ভিড়ের ভেতর ধাক্কা খেতে খেতে দীপঙ্করকে নিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিল সুতপা। মেট্রো সিনেমা, গ্র্যান্ড হোটেল, একে একে পেরিয়ে গেল। হাঁটা তো নয়, সুতপার মনে হচ্ছিল, ডানা মেলে সে বাতাসে উড়ছে।

দীপঙ্কর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'কোথায় যাচ্ছি বলো তো আমরা?'

সুতপা বলেছে, 'চলোই না—'

আরও খানিক এগিয়ে পার্ক স্ট্রিটে এসে নাম-করা একটা চীনা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়েছিল সুতপা। হতবুদ্ধি দীপঙ্কর তাকে অনুসরণ করেছে শুধু। এক বিয়েবাড়িতে একদা যে লাজুক, নম্র, মৃদুভাষী, তরুণীটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, চার বছরে তার সঙ্গে সম্পর্কটা কত যে নিবিড় হয়েছে তা শুধু ওরা দু'জনেই জানে। এই গ্রহে সুতপাই তার প্রিয়তম নারী। মুখ দেখলে লহমায় টের পেয়ে যায়, ওর মধ্যে কী চলছে—সুখ, দুঃখ, ক্লেশ, যাতনা না আনন্দ। সুতপা কী ভাবছে, কী করতে চলেছে, তুখোড় থট-রিডারের মতো আগেই বলে দিতে পারে দীপঙ্কর। ওর মনের আনাচ-কানাচের কোনও কিছুই তার কাছে গোপন নেই। সেই মেয়েটির কর্মধারার তল সেদিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ক্বচিৎ কখনও খুব সাদামাঠা চায়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে এক কাপ বিস্বাদ চা, কাঠের টুকরোর মতো শক্ত দু'পিস টোস্ট বা সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে মশালা ধোসা কি ইডলি খাইয়েছে। সেই সুতপা কিনা পার্ক স্ট্রিটের মতো ঝাঁ-চকচকে এলাকায় শীতাতপনিয়ন্ত্রিত চীনা রেস্তোরাঁয়!

কোণের দিকের একটা টেবলে গিয়ে মুখোমুখি বসেছিল তারা। সুতপার মুখ থেকে চোখ সরাতে পারেনি দীপঙ্কর। হাঁ করে তাকিয়েই থেকেছে। আপাদমস্তক যে নারীটিকে জানো বলে তার ধারণা, সেদিন তাকে চেনাই যাচ্ছিল না। অপার রহস্যে ঘেরা এ এক আশ্চর্য মানবী।

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে চোখের কোণ দিয়ে দীপঙ্করকে লক্ষ করছিল সুতপা। তার সারা মুখে হাসির দ্যুতি। বলেছিল, 'কী দেখছ?'

দীপঙ্কর বলেছে, 'তোমাকে—'

'আমাকে আগে দেখ নি?'

'কয়েক শো বার।'

'তা হলে?'

'আজকের দেখাটা ভীষণ স্পেশাল ম্যাডাম—'

'মানে?'

দীপঙ্কর বলেছে, 'তুমি যে এমন একটি মিস্টিরিয়াস লেডি, আগে বুঝতে পারি নি।'

ভুরু সামান্য কুঁচকে গিয়েছিল সুতপার, 'ইয়ারকি করতে হবে না।'

'ইয়ারকি নয়, এরকম একটা অ্যারিস্টোক্র্যাট, দামি রেস্তোরাঁয় আমাকে টেনে আনবে, ভাবতে পারি নি। কী ব্যাপার বল তো?'

হালকা ধমক দিয়েছে সুতপা, 'কোনও ব্যাপার নয়। মেনু কার্ড রয়েছে। কী খাবে, অর্ডার দাও—'

ভয়ে ভয়ে দীপঙ্কর বলেছে, 'এখানকার খাবারের কত দাম জানো? বিলের ফিগার দেখলে হার্টফেল করে যাবে।' পরক্ষণে কাঁচুমাচু হয়ে গিয়েছিল সে, 'আমার পকেটে পনেরো টাকার বেশি কিন্তু নেই।'

ধমকানির মাত্রাটা এবার অনেক চড়িয়ে দিয়েছিল সুতপা, 'বিলের চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। মেনু দেখে তুমি শুধু অর্ডার দাও—'

'বাব্বা! তুমি একটা আস্ত মিন্ট হাতে পেয়ে গেছ মনে হচ্ছে?'

এবার গাঢ় গলায় সুতপা বলেছে, 'আমরা গরিব, খুবই গরিব। তাই বলে এক-আধ দিন কি ইচ্ছে করে না বাইরে ভালমন্দ কিছু একটু খাই?'

দীপঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেছে। তারপর বলেছিল, 'এখানকার বিল মেটানোর মতো টাকা তুমি কোথাও পেলে?'

সুতপা জানিয়েছিল, যে-ছেলেমেয়েদের সে পড়ায় একটা মাস শেষ হলে পরের মাসের প্রথম সপ্তাহেই তার মাইনে ওরা চুকিয়ে দেয়। কিন্তু এই মাসটায় একটি ছাত্রের বাড়িতে কিছু অসুবিধে ছিল। তার বাবা প্রথম সপ্তাহে টাকাটা দিতে পারেন নি। শেষ সপ্তাহে, এই পরশু দিন দিয়েছেন। পুরো মাইনে, অর্থাৎ পাঁচ শোটা টাকা তার ব্যাগেই আছে।

দীপঙ্কর আঁতকে উঠেছে, 'টাকাটা এভাবে খরচ করলে তোমাদের তো—' বাকিটা আর শেষ করেনি।

সুতপাদের মতো মানুষদের সংসারে পাঁচশো টাকা সামান্য নয়, বিরাট অঙ্কের অর্থ। বিশেষ করে মাসের শেষ দিকে। এমনিতে সে প্রতিটি পয়সা হিসেব করে,

গুনে গুনে খরচ করে। কিন্তু সেদিন ছিল পুরোপুরি বেপরোয়া। তুড়ি মেরেই সে সাংসারিক সমস্যার ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়েছিল, 'সে আমি যেভাবে পারি ম্যানেজ করে নেব।'

'ধার করবে?'

সুতপা ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, 'ধার করি, চুরি করি, ডাকাতি করি, সে-সব আমি বুঝব। তোমাকে যা বলছি তাই করবে কিনা বল?'

তারপরও একটা ফ্যাকড়া তুলেছিল দীপঙ্কর, 'কিন্তু—'

'আবার?' সুতপা চোখ পাকিয়েছে, 'আমি চলে যাচ্ছি। এটা না সেটা, হ্যান না ত্যান—ভ্যাজর ভ্যাজর করে মাথা খারাপ করে দিলে।'

সে উঠে পড়েছিল। হাত ধরে তাকে বসিয়ে দিতে দিতে হাসিমুখে দীপঙ্কর বলেছিল, 'অত রাগ করছ কেন? আমার কথাটা আগে শুনবে তো?'

থমথমে মুখ করে বসে পড়েছিল সুতপা। উত্তর দেয় নি। তার হাতে হাত রেখে দীপঙ্কর বলেছে, 'দেড়টায় তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। তোমার মা-বাবা কতগুলো মিষ্টি খাইয়েছেন বল তো। এখনও সেগুলো হজম হয় নি। তারপর এখনই যদি খাই, প্রাণে কি বাঁচব?'

সুতপা বলেছিল, 'বাঁচবে কি মরবে, জানার দরকার নেই। আমার যখন ইচ্ছে হয়েছে, তখন খেতেই হবে।'

হাত দু'টো উলটে দিয়ে মজাদার ভঙ্গি করেছিল দীপঙ্কর, 'হার ম্যাজেস্টির যখন আদেশ, পালন তো করতেই হবে।' মেনু-কার্ড দেখে দু-তিন পদ খাবারের অর্ডার দিয়েছিল সে। সবশেষে আইসক্রিম। সমস্ত মিলিয়ে খরচ হয়েছিল দুশো টাকার মতো।

সেই যে 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস'-এ কাজটা পেয়েছিল, সেটাই করে চলেছে সুতপা। এর মধ্যে কত জায়গায় দরখাস্ত পাঠিয়েছে, স্কুল সারভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসেছে দু-দু'বার, কিন্তু কিছুই হয়নি।

দীপঙ্করেরও একই হাল। 'ড্রিমল্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং'-এ পার্ট টাইম আর টিউটোরিয়ালে ক্লাস পিছু কিছু মজুরি।

শক্ত মাটির ওপর দাঁড়াবার মতো পাকা চাকরি কারওই হচ্ছিল না। রোজগার কিছু হয় ঠিকই, কিন্তু স্থায়ী নিরাপত্তা কোথায়? ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় ভরা। মাঝে মাঝে ভেঙে পড়ত সুতপা। অনন্ত কাল কি এভাবে চলতে পারে?

কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময় বার করে মাঝে মাঝে তারা বেরিয়ে পড়ত। কোথায় কতদূরে আর যাবে? এই শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘন্টার পর ঘন্টা হেঁটে বেড়াত। হাতে চীনা বাদাম কি ঝালমুড়ির ঠোঙা। 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস'-এ কাজটা

হবার পর সেই যে বে-হিসেবি দুশোটা টাকা দুম করে সুতপা খরচা করে ফেলেছিল সেটা তো রোজ রোজ সম্ভব নয়। কালেভদ্রেও না। তাই কখনও বাদাম। কখনও ঝালমুড়ি। কখনও আগুনে সেঁকা কচি ভুট্টা, নুন আর পাতিলেবুর রসে মাখানো।

হাঁটতে হাঁটতে অনবরত কথা বলে যেত দীপঙ্কর। কানের কাছে সারাক্ষণ কলরব। সুতপা ধৈর্যশীল শ্রোতা। সে শুনত বেশি, বলত কম। হাঁটতে হাঁটতে একজন পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ পেরিয়ে গেল। আরেক জন তিরিশ পার হয়েছে কবেই। তবু মনে হত, তারা যেন দুই কিশোর কিশোরী প্রণয়ী, যাদের কলকলানি কখনও থামে না।

একদিন দীপঙ্কর আচমকা জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা ক'বছর আমাদের আলাপ হয়েছে?'

সুতপা অবাক, 'কেন বল তো?'

'ওটা কি আমার প্রশ্নের জবাব হল?'

একটু চিন্তা করে সুতপা উত্তর দিয়েছে, 'প্রায় চার বছর।'

দীপঙ্কর বলেছে, 'এই চার বছরে আমরা কলকাতার রাস্তায় কত মাইল হেঁটেছি বলতে পার?'

'কী উদ্ভট কথা। আমি কি প্রথম দিন থেকে বেরিয়ে ফিতে দিয়ে মেপে মেপে টুকে রেখেছি? তোমার মাথায় আসেও—'

দীপঙ্কর বলেছে, 'আমি কিন্তু জানি—'

'কী জানো?'

'আমরা এক হাজার সাত শো তেত্রিশ মাইল আটান্ন গজ হেঁটেছি।'

'খালি ফাজলামো—' ঝঙ্কার দিয়ে উঠতে গিয়ে হেসে ফেলেছে সুতপা।

এবার গভীর স্বরে দীপঙ্কর বলছে, 'চার বছর ধরে খালি হাঁটছিই। কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলবে?'

বুঝতে না পেরে সুতপা জিজ্ঞেস করেছে, 'মানে?'

'মানে লাইফের লাস্ট দিন পর্যন্ত আমরা কি শুধুই হেঁটেই যাব?'

ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছিল সুতপা। মুখ নিচু করে সে চুপ করে থেকেছে।

দীপঙ্কর থামে নি, 'চার চারটে বছর কেটে গেল। একসঙ্গে থাকার কথা কবে আর আমরা ভাবব?'

আবহাওয়া নিমেষে ভারী হয়ে গিয়েছিল। গাঢ় বিষাদে যেন ভরে যাচ্ছিল দশ দিগন্ত।

একসঙ্গে থাকা অর্থাৎ বিয়ের কথা সুতপাও কি ভাবে নি? অন্য দশটা মেয়ের মতো তার সাধও বিরাট কিছু তো নয়। অঢেল আরামের কথা সে ভাবে না।

‘একটু একটু করে এগোবো। প্রথমে চাবুক, তারপর ঘোড়া।’

হতভম্ব সুতপা জিজ্ঞেস করেছিল, ‘মানে?’

দীপঙ্কর বলেছে, ‘সিম্পল। আগে বিয়েটা হয়ে যাক। ওটা হলে অন্য সব সমস্যার জট ছাড়াবার চাড়টা বেড়ে যাবে।’

শেষ পর্যন্ত ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে যাওয়া হয় নি। দিন কেটে গেছে একঘেয়ে। গতানুগতিক। তারই ফাঁকে ফাঁকে পাকা চাকরির জন্য দু’জনে হন্যে হয়ে খোঁজ করে গেছে। কিন্তু কিছুই জোটাতে পারে নি।

ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছিল সুতপা। কিন্তু অফুরান উৎসাহ দীপঙ্করের। সে তাকে মিইয়ে পড়তে দেয় নি। তার আশাকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে জিইয়ে রেখেছে।

তারপর আজ যা ঘটল, স্বপ্নেও এমনটা হয় না। কৃষ্ণকিশোর অতগুলো বকেয়া টাকা, প্রায় রাজার ঐশ্বর্য পেয়ে গেছেন। রূপকথার বোধহয় মৃত্যু নেই। কারও কারও জীবনে আচমকা দেখা দিয়ে সমস্ত কিছু অজস্র আলোয় ভরে দেয়।.....

শুয়ে থাকতে থাকতে কখন একসময় দু’চোখ বুজে এসেছে নিজেরই খেয়াল নেই সুতপার।

পাঁচ

‘ছোট খুকি, ছোট খুকি—’ কার যেন অনবরত ডাকে ঘুম ভেঙে গেল সুতপার। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল সে। শিয়রের দিকের জানালা খোলা ছিল। সেখান দিয়ে রোদের ঢল নেমেছে ঘরের ভেতর। এর মধ্যেই রোদ তপ্ত হয়ে উঠেছে। মে মাসে সকাল হতে না হতেই সূর্যরশ্মি তেতে ওঠে। বেলা যত বাড়ে তাপ ততই অসহ্য হতে থাকে। মনে হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবে।

চোখ রগড়ে চট করে মান্ধাতার আমলের দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল সুতপা। সাতটা বেজে আটচল্লিশ। অন্য দিন, শীতগ্রীষ্ম বারো মাস, ছ’টার ভেতর উঠে পড়ে সে। কেন না ঠিক ন’টায় মির্জাপুরে পৌঁছে ডি.টি.পি মেশিনের সামনে বসতে হয়। স্নান সেরে নাকেমুখে চাট্টি গুঁজে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে বেরোতে না পারলে ঠিক সময়ে কাজ শুরু করা যায় না। ডিউটির ব্যাপারে সে ভীষণ সজাগ। তার কাছে ন’টা মানে ঠিক ন’টা। ক’বছর কাজ করছে, কিন্তু কোনও দিন ‘লাহিড়ী’স লেজারগ্রাফিকস’-এ হাজিরা দিতে পাঁচ মিনিটও দেরি হয় নি।

কাল সন্ধে থেকে সুতপার সময়ে কেটেছে তীব্র উত্তেজনায়। অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে। প্রচুর রান্নাবান্না এবং খাওয়া-দাওয়ার পর শুতে শুতে অনেক রাত হয়ে

গিয়েছিল। তাই এতকালের নিয়মে হেরফের ঘটে গেছে। সময়মতো উঠতে পারে নি।

ডাকাডাকিটা চলছিলই, 'ছোট খুকি, ছোট খুকি—'সেই সঙ্গে দরজায় অল্প অল্প ধাক্কা। নিশ্চয়ই ছোটদি অর্থাৎ নমিতা।

ভেতর থেকে খিল দিয়ে শুয়েছিল সুতপা। ব্যস্তভাবে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলে দিল।

নমিতা বলল, 'কি রে, কতক্ষণ ধরে ডাকছি। সাড়াশব্দ নেই। কোনওদিন তো এত বেলা অব্দি ঘুমোস না—'

সুতপা একটু হাসল, উত্তর দিল না।

নমিতা বলল, 'আজ বাড়ির সবারই উঠতে দেরি হয়ে গেছে। মুখটুখ ধুয়ে এক্ষুনি বাবার ঘরে চলে আয়।'

সুতপা অবাক, 'কেন রে? বাবা সবাইকে যেতে বলেছে। ওখানেই আজ সকালের চা খাওয়া হবে।'

আর সব দিন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নমিতা এক তলার কিচেনে গিয়ে চা করে ফেলে। রাজেশ্বরী ছাড়া বাড়ির বাকি সকলে সেখানে নেমে চা খেয়ে আসে। আজকের দিনটা ব্যতিক্রম। সুতপার মনে পড়ে গেল, কাল বাবা রাতারাতি মিলিয়নেয়ার বনে গেছে। এখন এ-বাড়ির হালচাল, নিয়মটিয়ম পালটে যাবে। এ নিয়ে সে আর কোনও প্রশ্ন করল না। শুধু বলল, 'তুই যা। আমি আসছি।'

নমিতা চলে গেল।

সুতপার ঠাকুরদা নন্দকিশোর দত্ত সেই আমলে একটা কাজের কাজ করে গেছেন। প্রতিটি বেডরুমের সঙ্গে 'মহামায়া ধাম-'এ একটা করে চানঘরের ব্যবস্থা করেছিলেন। অ্যাটাচড বাথ।

বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে সুতপার মনে হল, আজ সাড়ে দশটার আগে কিছুতেই মির্জাপুর পৌঁছুনো যাবে না। 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস'-এ ঢোকার পর আজই প্রথম তার লেট হবে।

কিছুক্ষণ পর মা-বাবার ঘরে আসতেই দেখা গেল, সকলে হাজির। কৃষ্ণকিশোর আর রাজেশ্বরী খাটে বসে আছেন। নিচে বেতের মোড়ায় নমিতা আর নান্টু। একটা নড়বড়ে পুরনো টেবলের ওপর কয়েক কাপ চা আর প্ল্যাস্টিকের লাল প্লেটে থিন অ্যারারুট বিস্কুট।

সুতপা একটা মোড়া টেনে নমিতা আর নান্টুর পাশে বসল।

কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'তোর জন্যেই ওয়েট করছিলাম। নে, চা খা—'

সবাই বিস্কুট আর চায়ের কাপ তুলে নেয়।

চায়ে হালকা চুমুক দিয়ে সুতপা বলে, 'কী হল বাবা, আজ একেবারে সক্কালবেলায় তোমার ঘরে আসর বসিয়ে দিয়েছ যে?'

কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'আজকের দিনটা আলাদা বলে। অন্য দিন তোর বেরোবার তাড়া থাকে। আমাকে বাজারে ছুটতে হয়। মেজ খুকি সকাল হতে না হতেই রান্নাঘরে ঢোকে। আজ তাড়াহুড়োর দরকার নেই। অনেকদিন তো একসঙ্গে বসে আয়েস করে গল্প করতে করতে চা'টা খাওয়া হয় না। তাই ভাবলাম—'

কাল সন্ধে থেকে কৃষ্ণকিশোর দারুণ খুশির মেজাজে আছেন। ক'বছর ধরে পারিবারিক সংকটগুলো তাঁর মুখে একের পর এক ভাঁজ ফেলে গেছে। কপালের চামড়া আর চোখ কুঁচকে থাকত। সারাক্ষণ বিরক্তি। সবসময় তিক্ততা। কণ্ঠস্বর রুক্ষ। গোটা পৃথিবীর ওপর তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে থাকতেন। প্রচণ্ড চাপে পিঠ নুয়ে থাকত। সেই মানুষটাকে এখন আর চেনা যায় না। প্রশান্ত মুখমণ্ডল। যেন জাগতিক সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তাঁর ধারেকাছে কোথাও কোনও অশান্তি নেই। নেই কোনও উৎকণ্ঠা। কৃষ্ণকিশোর এখন এক নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ মানুষ।

সুতপা বলল, 'বসে বসে গল্প করার সময় নেই। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমাকে স্নান করে এক্ষুনি কাজে বেরোতে হবে। ছোটদি যখন রান্না চড়াতে পারেনি, দুপুরে কোথাও খেয়ে নেব। মির্জাপুরে অনেক ভাল ভাল হোটেল আছে।'

'না।'

'না মানে?

'আজ আর তোকে প্রেসে যেতে হবে না।'

কৃষ্ণকিশোর 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস'কে প্রেস বলেন। সুতপা অবাক। বলল, 'কী বলছ তুমি বাবা! কাল তোমার ফোন পেয়ে আর্জেন্ট কাজ ফেলে চলে এসেছিলাম। ওগুলো করে না দিলে প্রদোষদা ভীষণ বিপদে পড়ে যাবেন। দু'দিনের ভেতর পুরো কম্পোজ তুলে দিতে না পারলে পাবলিশার বই বার করতে পারবে না। তাদের ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে।'

কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'বেলার দিকে ফোন করে তোর প্রদোষদাকে বলে দিস, অন্য কাউকে দিয়ে যেন কম্পোজটা করিয়ে নেয়। আর—'

'আর কী?'

'অত কষ্ট করে রোজ রোজ মির্জাপুর গিয়ে ওই কাজটা তোকে আর করতে হবে না। এখন তো আমাদের আর কোনও প্রবলেম নেই।'

'বাবা!' সুতপা চাপা, তীব্র গলায় চেঁচিয়ে ওঠে।

কৃষ্ণকিশোর অবাক, 'কী হল রে?'

ভর্ৎসনার সুরে সুতপা বলল, 'প্রদোষদা কাজটা দিয়েছিল বলে এই ক'বছর

আমরা দু'টো ডাল-ভাত খেয়ে বেঁচে আছি। নইলে না খেয়ে মরতে হত। হঠাৎ অনেক টাকা হাতে পেয়ে গেছ বলে ওটা ছেড়ে দিতে বলছ!' সে আরও জানায়, দু'পয়সা হোক, চার পয়সা হোক, পরিশ্রম করে সে রোজগার করে। সম্মানের সঙ্গে। ওটা ছাড়তে পারবে না। তা ছাড়া, হুট করে একজন ভাল কম্পোজিটর পাওয়া মুশকিল। 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস'কে বিপদে ফেলে হঠাৎ সরে আসা ভীষণ অন্যায়। যার সামান্য কৃতজ্ঞতাবোধ আছে সে এটা করে না।

রাজেশ্বরী, নমিতা এবং নান্টুও তার কথায় সায় দিল। সমস্বরে।

কৃষ্ণকিশোর হকচকিয়ে গেলেন। লজ্জাও পেলেন খুব সম্ভব। 'আমরাই ভুল হয়েছে। আপাতত কাজটা চালিয়ে যা। পরে এ নিয়ে ভাবা যাবে। সত্যিই তো, তোর প্রদোষদা পাশে না দাঁড়ালে আমরা ভীষণ মুশকিলে পড়ে যেতাম।' একটু থেমে বললেন, 'তবে আজকের দিনটা ছুটি নিয়ে নে।'

'কেন?'

'আমার বয়েস সত্তর হতে চলল। কতকালই বা বাঁচব! শেষ ক'টা দিন যাতে আরামে কাটে, চটপট তার ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে।' কাল রাতে যে-সব পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন সেগুলো ফের নতুন করে শোনালেন কৃষ্ণকিশোর।

মাঝখানের ক'টা বছর কী ক্লেশের মধ্যেই না কেটেছে। অভাব অনটন। স্ত্রীর অসুখ। নিজের তিন ছেলেমেয়ের জন্য অশেষ দুর্গতি। সব মিলিয়ে দিশেহারা, উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা।

এদিকে আয়ু ফুরিয়ে আসছে। জীবনের ম্যারাথন দৌড় প্রায় শেষ। হাতে সময় আর কতটুকু? তাই কালবিলম্ব করতে চান না। বড্ড তাড়া। এতগুলো টাকা যখন পেয়েই গেছেন, বাকি জীবনটা একটু উপভোগ করতে চান। এই বয়সের পক্ষে যতটা সম্ভব সুখে, আরামে। হয়ত একটু বিলাসেও।

কৃষ্ণকিশোরের মনোভাব বুঝতে পারছিল সুতপা। ছেলেমেয়েদের আজ তিনি ছাড়তে চাইছেন না। ভবিষ্যতের যে ছকটা কষেছেন, সেটা নিয়ে সন্তানদের সঙ্গে চুলচেরা আলোচনা করতে চাইছেন। আনন্দ করার মতো ঘটনা এ-বাড়িতে বহুকাল ঘটেনি। বাবাকে নিরাশ করতে ইচ্ছে হল না সুতপার। একটু ভেবে বলল, 'ঠিক আছে, আমি প্রদোষদাকে ফোন করে দেব।'

কৃষ্ণকিশোর সমানে কথা বলে চলেছেন। বিপুল উচ্ছ্বাসে। একটানা। তাঁকে প্রায় থামানোই যাচ্ছে না। এই করবেন, সেই করবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

চা খাওয়া হয়ে গেলে সুতপা বেরিয়ে পড়ল। প্রদোষ এবং দীপঙ্করকে কালই ফোন করা উচিত ছিল। ওরা নিশ্চয়ই ভীষণ চিন্তায় আছে।

নরেশ আড্ডি রোড যেখানে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে সেই মোড়ের মাথায়

কাতার দিয়ে অনেকগুলো দোকান। ওষুধের। স্টেশনারির। মুদিখানা। লন্ড্রি। তা ছাড়া, চারদিক আলো করে 'গণেশ কেবিন' বিরাজ করছে। বেকারদের চিরস্থায়ী আড্ডাখানা।

সুতপা বেশির ভাগ সময় ওষুধের দোকানটা থেকে ফোন করে। নাম 'লোকনাথ মেডিকেল হল'। ক্বচিৎ কখনও স্টেশনারি দোকান 'রকমারি' থেকেও। আজ দেখা গেল এই সকালবেলাতেও ফোন করার জন্য সাত আট জন দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে আধ ঘন্টার আগে সে ফোনে হাত ঠেকাতে পারবে না।

সুতপা লক্ষ করল, খানিক দূরে 'রকমারি'তে ফোনের জন্য তেমন ভিড় নেই। মাত্র দু-তিন জন। সে সোজা ওখানেই চলে গেল।

'লোকনাথ মেডিকেল হল' আর 'রকমারি'তে ছোট্ট ঘেরা জায়গায় ফোন করার ব্যবস্থা। বাইরে কেউ থাকলে ভেতরের কথা শুনতে পায় না। এমন অনেক কথা থাকে, যা অন্যের সামনে বলতে ভীষণ অস্বস্তি হয়।

পাঁচ মিনিটও দাঁড়াতে হল না। প্লাইউড আর কাচ দিয়ে ঘেরা খাড়া বাক্সমতো জায়গাটায় ঢুকে গেল সুতপা।

প্রদোষদের বাড়িতে টেলিফোন আছে। সাড়ে আটটাও বাজে নি। এখন তাঁকে বাড়িতেই পাওয়া যাবে। ডায়াল করতে পাওয়াও গেল।

প্রদোষ বললেন, 'তুমি কী মেয়ে বল তো? কাল বলে গেলে বাবার সঙ্গে দেখা করার পর কী হয়েছে না হয়েছে আমাকে জানিয়ে দেবে। যতক্ষণ অফিসে ছিলাম তোমার ফোনের জন্যে অ্যাংশাসলি ওয়েট করছিলাম। সাড়ে ন'টায় অফিস বন্ধ করে বাড়ি চলে এলাম। তুমি জানো আমাকে ঘুমের ওষুধ খেয়ে এগারোটার ভেতর শুয়ে পড়তে হয়। বারোটা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছি। তোমার ফোন এলই না। শেষ পর্যন্ত সিডেটিভ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।'

সুতপা কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তাকে দাবড়ে দিয়ে প্রদোষ বললেন, 'তুমি তো ধীর, স্থির মেয়ে। তোমার বিরাট দায়িত্ববোধ। কিন্তু কাল একবার ভাবলে না, একটা লোক কী ভীষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছে? তোমার কাছে এটা আশা করি নি।'

সুতপা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে প্রদোষদা—'

প্রদোষ অদ্ভুত মানুষ। ক্রোধ ক্ষোভ অভিমান, বেশিক্ষণ কিছুই পুষে রাখতে পারেন না। লহমায় সব উধাও হয়ে যায়। বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার আমার দুর্ভাবনার অবসান ঘটাও। কাল কী হয়েছিল, বল—' তাঁর কণ্ঠস্বর এখন অনেক স্নিগ্ধ।

এই মানুষটার মধ্যে লেশমাত্র মালিন্য নেই। মাঝে মাঝে মজা করেন বটে, কিন্তু যেন স্নেহময় এক অভিভাবক। সুতপা বলল, 'খারাপ কিছু ঘটে নি। বাবা হঠাৎ কিছু টাকা পেয়েছেন। মানে অফিসের—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রদোষ বললেন, 'খারাপ কিছু যে হয় নি, এতেই আমি খুশি। ন'টায় তোমার পৌঁছনোর কথা। এখনই তো সাড়ে আটটা বাজে। সাড়ে-দশটা এগারোটার আগে আজ কি আসতে পারবে?'

ক'বছর তো প্রদোষকে দেখছে সুতপা। 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস'-এ যারা কাজ করে তাদের কারও কোনও দুঃসংবাদ শুনলে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েন। সাধ্যমতো পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করেন। কারও ভাল খবর থাকলে তাঁকে যথেষ্ট আনন্দ দেয়। সব মিলিয়ে নির্ভেজাল ভাল মানুষ। সহৃদয়। সহানুভূতিশীল। তাঁর মধ্যে চাতুরির লেশমাত্র নেই।

ঢোক গিলে সুতপা বলল, 'আজকের দিনটা ছুটি চাইছি প্রদোষদা—'

প্রদোষ অবাক হলেন। অসুখ বিসুখ না করলে বা জরুরি কারণ না থাকলে সুতপা কখনও কামাই করে না। জিজ্ঞেস করলেন, 'শরীর টরীর খারাপ হয়েছে?'

'না। একটা বিশেষ দরকারে আমাকে আজ বাড়িতে থাকতে হবে।।'

'কিন্তু—'

'সেই আর্জেন্ট কম্পোজগুলোর কথা বলছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'কাল থেকে রোজ দু-এক ঘন্টা এক্সট্রা খেটে ঠিক সময়ে কাজটা কমপ্লিট করে দেব। আপনি চিন্তা করবেন না।'

'ঠিক আছে।'

প্রদোষের সঙ্গে কথা শেষ করে অনুকূল ধরদের বাড়িতে ফোন করল সুতপা। ফোনটা অনুকূল বাবুই ধরেছেন। প্রৌঢ়, নির্বিরোধ, আলাভোলা ধরনের মানুষ। গোলগাল টাক মাথা। একবারই মাত্র তাঁকে দেখেছে সে। তবে কত বার যে দীপঙ্করকে ডেকে দেবার জন্য ওঁদের বাড়িতে ফোন করেছে, ইয়ত্তা নেই।

সুতপার গলার স্বর অনুকূল ধরের চেনা। দীপঙ্করের সঙ্গে তার যে একটা সম্পর্ক রয়েছে, সাদামাঠা আলাপ-পরিচয়ের চাইতে সেটা যে অনেক বেশি গভীর, সেটা তিনি আঁচ করতে পারেন। ভদ্র মানুষ। এই নিয়ে কখনও কৌতূহল প্রকাশ করেন নি।

অনুকূল বলল, 'একটু ধর। আমি দীপুকে খবর দিচ্ছি।' অনেক দিন পাশাপাশি বাড়িতে আছেন। দীপঙ্করের যখন ষোল বছর বয়স, তখন থেকে তার ডাক-নাম দীপু বলেই ডাকেন।

মিনিট তিনেক পর দীপঙ্করের গলা ভেসে এল, 'কাল বলেছিলে, বাবার সঙ্গে দেখা করার পর আমাকে ফোন করে জানাবে। তুমি তো এত ইররেসপনসিবল নও। ফোন কর নি কেন?' প্রদোষের মতো একই অভিযোগ দীপঙ্করের। 'জানো কী ভীষণ টেনশনে ছিলাম?'

সুতপা মিয়ানো গলায় প্রথমেই তার দোষটা মেনে নেয়। কৈফিয়ত হিসেবে জানায়, কাল কৃষ্ণকিশোরের সঙ্গে দেখা হবার পর একের পর এক এমন সব চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে গেছে যাতে ফোন করার মতো একটুও সময় বার করতে পারে নি। অকপটে স্বীকার করছে, রাতে যখন ফুরসত পাওয়া গেল, অনেক দেরি হয়ে গেছে। ততক্ষণে যে-সব দোকান থেকে সে ফোন করে, সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। আজ সকালে উঠতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। কোনওরকমে চা খেয়ে এক সেকেন্ডও দেরি করে নি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দীপঙ্করকে ফোন করতে এসেছে।

হঠাৎ যেন সময় সম্পর্কে খেয়াল হল দীপঙ্করের, 'কী ব্যাপার, ন'টা বাজতে চলল, কাজে বেরোবে না?'

'না। আজ প্রদোষদাকে বলে ছুটি নিয়েছি।'

এ নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করল না দীপঙ্কর। বলল, 'কী হয়েছিল কাল?'

একটু চিন্তা করে সুতপা জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে অনুকূলবাবু বা ওঁদের বাড়ির আর কেউ আছেন? নাম না করে 'হ্যাঁ' কি 'না' বলে যাও।'

'আছেন। কেন?'

'তা হলে বিকেলে কোথাও মিট করে সব বলব।'

'না, বিকেলে নয়। এখনই শুনতে চাই।'

দীপঙ্করের গলা শুনে মনে হল, তার তর সইছে না। এমনিতে সব ঠিক আছে, কিন্তু ধৈর্যটা কম। সুতপা বলল, 'ফোনে বলা যাবে না।'

দীপঙ্কর বলল, 'ফোনে কে জানতে চাইছে? তুমি দেশপ্রিয় পার্কের উলটোদিকে তীর্থপতি ইনস্টিটিশনের সামনে চলে এস। আমিও যাচ্ছি—'

দীপঙ্করদের বাড়িটা পণ্ডিতিয়ার ভেতর দিকে একটা গলিতে। তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনের সামনে আসতে তার বেশি সময় লাগবে না। এদিকে চেতলা থেকে এখন অটোর স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কোনওটার দৌড় কালীঘাট পাতালরেল স্টেশন পর্যন্ত। কোনওটা যায় গাড়িয়াহাট। গড়িয়াহাটের অটো ধরলে দশ বারো মিনিটের মধ্যে দেশপ্রিয় পার্ক।

সুতপা বলল, 'এখন কী করে যাব? বাড়িতে অনেক দরকারি কাজ আছে।'

'এক ঘন্টার বেশি তোমাকে আটকাব না। চলে আসবে কিন্তু—' সুতপাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিল দীপঙ্কর।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে পয়সা মিটিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল সুতপা। নিজের দিকে একবার তাকাল। পরনে আধময়লা সালোয়ার কামিজ। কাল এ-সব পরেই শুয়েছিল। এখন পোশাক পালটাতে বাড়ি গেলে বাবা কিছুতেই ছাড়বে না। একটু ইতস্তত করল সে। তারপর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা অটো ধরে দেশপ্রিয় পার্কে এসে নেমে পড়ল।

ছয়

রাস্তা পেরিয়ে ওপারে যেতে যেতে সুতপার চোখে পড়ল তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনের সামনের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে দীপঙ্কর। তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কখন এসেছ?'

দীপঙ্কর বলল, 'বেশিক্ষণ না। এই তিন চার মিনিট।' খানিক দূরেই একটা মাঝারি রেস্তোরাঁ—'নিউ কাফে'। গরমের সময় সাতটায় খুলে যায়। দুপুরে দু'ঘন্টা বন্ধ থাকে। তারপর চলে একটানা রাত ন'টা পর্যন্ত।

বেশ বেলা হয়েছে। রাসবিহারী অ্যাভেনিউতে এখন জনস্রোত। চারপাশে তুমুল কলরোল। নানা দিক থেকে ট্রাম বাস মিনিবাস প্রাইভেট কার, এমনি অগুনতি যানবাহনের পাঁচমেশালি আওয়াজ উঠছে।

'নিউ কাফে'তে আলাদা বসার জন্য পর্দা-ঢাকা ক'টা কেবিন রয়েছে। সকালের দিকটায় ওগুলো প্রায় খালিই থাকে। সুতপাকে নিয়ে তার একটায় ঢুকে পড়ল দীপঙ্কর। সুতপার খাওয়ার ইচ্ছা নেই। তার আপত্তি উড়িয়ে দিয়ে একটা বয়কে ডেকে টোস্ট ওমলেট এবং চায়ে অর্ডার দিয়ে দীপঙ্কর বলল, 'কাল কী হয়েছিল, এবার বল—'

একটু মজা করতে ইচ্ছা হল সুতপার। মুখটা কাঁচুমাচু করে বলল, 'আমরা ভীষণ সমস্যায় পড়ে গেছি।'

'সমস্যা!' দীপঙ্কর হকচকিয়ে গেল। তার চোখে মুখে উৎকণ্ঠা।

'হ্যাঁ—' আস্তে আস্তে মাথা দোলায় সুতপা।

'ফ্যামিলির কারও কিছু হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

দীপঙ্করের কপালে ভাঁজ পড়ে, 'আমি কি কোনওভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'এক্ষুনি না। ভবিষ্যতে হয়ত করতে হতে পারে।'

'কী ধরনের সাহায্য?'

'সেটা বাবা বলতে পারে।'

পর্দা সরিয়ে দীপঙ্কর গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগল, 'বয়-বয়—'

সুতপা হতভম্ব। 'কী হল, বয়টাকে ডাকছ কেন?'

দীপঙ্কর বলল, 'অর্ডার ক্যানসেল করে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

সুতপা চমকে ওঠে, 'না—না।' তারপরেই ফিক করে হেসে ফেলে। হাসলে

তাকে সুন্দর দেখায়। মনে হয়, বয়সটা লহমায় কমে গিয়ে সে এক নিষ্পাপ কিশোরী হয়ে গেছে।

চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুতপাকে নিরীক্ষণ করে দীপঙ্কর। সুতপা যে তার সঙ্গে রগড় করছে, এবার বুঝে ফেলে, 'ফাজলামো হচ্ছে, না?'

বয়টা দৌড়ে চলে এসেছিল। সুতপা হাসতে হাসতে হাত নেড়ে তাকে বলে, 'তুমি যাও। তাড়াতাড়ি খাবার নিয়ে এস—'

বয়টা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর পেছন ফিরে সুতপাদের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে যায়।

সুতপা দীপঙ্করের চোখে চোখ রাখে। মুখে হাসি লেগেই আছে। বলে, 'রহস্যটা এবার ফাঁস করে ফেলি। জানো, বাবা অফিসের বকেয়া সব টাকা কাল পেয়ে গেছে।'

কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে দীপঙ্কর। শুনেও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না তার। বলে, 'তাই?'

'ইয়েস স্যার—'

'এই টাকাটার জন্যে ক'বছর খুব ছোটাছুটি করেছেন না?'

সুতপা মাথা নাড়ে, 'আমরা তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তারপর মিরাকলটা ঘটে গেল।'

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করে, 'ওই খবরটা দেবার জন্যেই কি তোমার বাবা গড়িয়াহাটে তোমাকে দেখা করতে বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়িতেই তো যেতে বলতে পারতেন। ওখানে কেন?'

কারণটা জানিয়ে দিল সুতপা।

দীপঙ্কর বলল, 'এমন ব্যাপারের পর সেলিব্রেট করার ইচ্ছে তো হতেই পারে। তা—'

'কী?'

'কিছু মনে করো না। একটা ব্যাপারে আমার একটু কৌতূহল হচ্ছে।'

'বল না—'

দীপঙ্কর সঙ্কোচের সুরে বলল, 'তোমার বাবা কত টাকা পেয়েছেন?'

সুতপা বলল, 'চোদ্দ লক্ষ সাতাত্তর হাজার আটশো—'

শিরদাঁড়া টান টান হয়ে যায় দীপঙ্করের। চোখের তারা দু'টো স্থির। বলল, 'মাই গড। তোমরা তা হলে এখন মিলিওনেয়ার!'

সুতপা ঠোঁট টিপে হাসে। উত্তর দেয় না।

দীপঙ্কর বলে, 'তোমাদের আর কোনও প্রবলেমই থাকবে না। সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

সুতপা বলল, 'সব না হলেও অনেক সমস্যাই মিটে যাবে। বাবা তো কাল রাত থেকেই আমাদের নিয়ে নানারকম প্ল্যান করতে শুরু করেছে।' সে সবিস্তার জানায়, ওই টাকা দিয়ে তাদের বাড়ি সারানো হবে, নমিতার ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করা হবে, নান্টুকে ফের কলেজে ভর্তি করানো হবে, ইত্যাদি নানা পরিকল্পনা।

বয়টা টোস্ট আর ওমলেটের প্লেট সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। খাওয়া শেষ হলে চা দেবে।

খাবারের দিকে নজর নেই দীপঙ্করের। টেবলের ওপর ঝুঁকে অসীম আগ্রহে জিজ্ঞেস করে, 'অনেক কিছুই তো করবেন কিন্তু ছোট কন্যা সম্বন্ধে কী ঠিক করেছেন তা তো বললে না—'

ছোট কন্যা অর্থাৎ সুতপা। সে বলল, 'বাবার ইচ্ছে আমি 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস'-এর কাজটা ছেড়ে দিই।'

হঠাৎ যেন খেয়াল হয়েছে এমনভাবে দীপঙ্কর বলে ওঠে, 'আরে তাই তো, এখন তোমার মির্জাপুরে থাকার কথা। আজ থেকেই কি কাজটা ছেড়ে দিলে!'

'নো স্যার। কাল খেতে খেতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। সকালে ঘুম ভেঙেছে বেশ দেরিতে। তাই আজ আর যাই নি। প্রদোষদাকে ফোন করে জানিয়েও দিয়েছি।' সুতপা বলল, 'বাবা যত টাকাই পাক, কাজটা আমি ছাড়ছি না।'

লঘু সুরে দীপঙ্কর বলল, 'হোল লাইফ কম্পোজই করে যাবে?'

'বাবার মোটেও তেমন ইচ্ছে নেই। মেয়ে ধুমসি আইবুড়ো হয়ে থাক, কোনও বাবা কি তা চাইতে পারে?'

দীপঙ্কর বলল, 'তার মানে তিনি তোমার বিয়ে দিতে চান?'

সুতপা বলল, 'এগ্‌জাক্টলি। কাল রাত্তিরে খেতে খেতে বাবা সেটা ঘোষণাও করে দিয়েছে। আটাশ পেরিয়ে উনত্রিশে পা রেখেছি। দাঁত পড়া চুল পাকার সময় হয়ে এল। আর দেরি করলে কে আর আমাকে বিয়ে করবে বল?'

দীপঙ্কর একটু কেশে গলা সাফ করে নিয়ে বলল, 'বাবার পছন্দ-করা ছেলে টেলে কেউ আছে নাকি?'

'যতদূর জানি নেই। এতদিন হাত খালি ছিল। আমার বিয়ের কথা ভাবতেই পারে নি। এখন টাকা এসে যাওয়ায় বাবার এনার্জি এত বেড়ে গেছে যে দু-চার উইকের ভেতর কাকেও না কাকে ঠিক জুটিয়ে ফেলবে।'

দীপঙ্কর শুধু বলল, 'হুঁ—'

চোখ ছোট করে, ঠোঁটে ঠোঁট টিপে কয়েক পলক দীপঙ্করকে দেখল সুতপা। তারপর বলল, 'এবার সময় হয়েছে। আর দেরি করা যাবে না।'

দীপঙ্কর অবাক, 'কিসের সময়?'

সুতপা বলল, 'বাবু কৃষ্ণকিশোর দত্ত'র কনিষ্ঠা কন্যার একটি পছন্দের মানুষ আছে। তার কথা বাবাকে জানাতে হবে।'

দীপঙ্করের চোখমুখ আলোয় ভরে যায়, 'কবে জানাচ্ছ?'

'সবে তো বাবা টাকাটা পেল। দারুণ এক্সসাইটেড হয়ে আছে। উত্তেজনাটা একটু কমুক। তারপর সুযোগ বুঝে একদিন বলে ফেলব।'

এতক্ষণে টোস্ট আর ওমলেটের প্লেটের দিকে যেন নজর পড়ল দীপঙ্করের। ছুরি দিয়ে ওমলেট কাটতে কাটতে হঠাৎ থমকে গেল সে, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আমার পার্মানেন্ট চাকরি নেই। কাজ করলে কিছু মজুরি পাই। নো ওয়ার্ক নো পে। আর তোমরা এখন মিলিওনেয়ার। বাবু কৃষ্ণকিশোর দত্ত কি তাঁর মেয়ের জন্য আমার আর্জি কি কনসিডার করবেন?'

মুখটা যতখানি সম্ভব করুণ করে সুতপা বলল, 'এটা একটা বিরাট প্রবলেম। তবে কৃষ্ণকিশোরবাবু যাতে কনসিডার করেন, সে জন্যে দরকার হলে প্রাণ দিয়ে দেব—'

পরস্পরের দিকে কয়েক মুহূর্ত তারা তাকিয়ে থাকে। তারপর একসঙ্গে শব্দ করে হেসে ওঠে।

সাত

কৃষ্ণকিশোরের বকেয়া টাকাটা পাওয়ার পর দিন দশেক কেটেছে। এর মধ্যে 'মহামায়া ধাম'-এ তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। মলিন, ম্রিয়মাণ, আধভাঙা, শ্যাওলাধরা বাড়িটা এতকাল দিবারাত্রি ঝিম মেরে পড়ে থাকত। যে-চারটি মানুষ এখানে বাস করে তাদের সর্বাঙ্গে লেপটে ছিল হতাশা আর উৎকণ্ঠা। সারাক্ষণ কেমন একটা নুয়ে-পড়া ভাব। ওদের দেখলেই মনে হতো, ধুঁকে ধুঁকে কোনও রকমে চলছে।

সেই 'মহামায়া ধাম' অলৌকিক ম্যাজিকে রাতারাতি বদলে গেছে। সারা বাড়ি এখন ঘুমের সময়টুকু বাদ দিলে সর্বক্ষণ সরগরম। বাসিন্দাদের চলায় ফেরায় কথাবার্তায় দারুণ চনমনে তরতাজা ভাব ফুটে বেরিয়েছে। এমন কি অসুস্থ শীর্ণ রাজেশ্বরী যিনি বিছানায় মিশে থাকতেন সদাসর্বদা, তাঁর চোখেমুখেও আলোর ঝলক খেলে যাচ্ছে।

এর মধ্যে খিদিরপুর থেকে রাজমিস্তিরি জয়নালকে ধরে নিয়ে এসেছিল নান্টু।

সে তার দলবল নিয়ে সারা বাড়ির চারপাশে ভারা বেঁধে মেরামতের কাজ শুরু করে দিয়েছে।

কৃষ্ণকিশোরের ঠাকুরদা নন্দকিশোর যখন এই সাদামাঠা বাড়িটা তৈরি করান তখন তাঁর মাথায় শখসৌখিনতার চিন্তা ছিল না। কম খরচে যতটা সম্ভব বেশি ঘরওলা বিল্ডিং বানানো যায়, এটাই তিনি ভেবেছিলেন। ফলে এ-বাড়ির বাথরুমগুলোতে সস্তা জলের কল, বেডরুমে সিমেন্টের মেঝে, কারুকার্যহীন দরজা জানালা, ইত্যাদি।

কৃষ্ণকিশোর ঠিক করে ফেললেন, অনেক কষ্ট করেছেন। টাকা যখন হাতে এসেই গেছে, সাধ মিটিয়ে আয়েস করে শেষ জীবনটা কাটিয়ে যাবেন। ঘরের মেঝেগুলো উপড়ে ফেলে মোজেক করা হবে। বাথরুমে টাইলস, ভাল ট্যাপ, শাওয়ার, ইত্যাদি বসাবেন। দরজা জানালা, মান্ধাতার আমলের সিলিং ফ্যান বদলে ফেলবেন। এতদিন কয়লার উনুন আর কেরোসিনের স্টোভ দিয়ে কাজ চালানো হয়েছে। এবার গ্যাস আনা হবে।

মাত্র দশ দিনে কৃষ্ণকিশোরের দশটা হাত আর দশটা বাড়তি পা যেন গজিয়ে গেছে। হেমোগ্লোবিন বেড়েছে। এনার্জি বেড়েছে শতগুণ। সর্বক্ষণ দৌড়ের ওপর আছেন। এই জয়নালদের কাজের তদারক করছেন। পরক্ষণে ছুটছেন প্লাম্বারের দোকানে কি টাইলসের খোঁজে কিংবা কোন কোম্পানি নতুন মডেলের ফ্যান বার করেছে তার সন্ধানে।

এর মধ্যে স্পেশালিস্টদের দিয়ে রাজেশ্বরীর ব্লাড, হার্ট থেকে শুরু করে নানারকম টেস্ট করানো হয়েছে। তিনি কখন কী ওষুধ খাবেন, পথ্য কী হবে, তার চার্ট করে দিয়েছেন ডাক্তাররা। সেই অনুযায়ী সব চলছে।

নান্টুকে তার পুরনো কলেজে নিয়ে গিয়েছিলেন কৃষ্ণকিশোর। দু'টো বছর নষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক হয়েছে, এ-বছর নতুন করে অ্যাডমিশান নিয়ে খুব শিগ্‌গিরই ক্লাস শুরু করবে। দিনে নয়, নাইটে পড়বে সে। দিনের বেলাটা তাকে নিয়ে কী যেন একটা পরিকল্পনা করেছেন কৃষ্ণকিশোর। সেটা এখনও ভাঙেননি। জিজ্ঞেস করলে বলেছেন, যথাসময়ে জানাবেন।

এ-পাড়ার একটি ছেলে, নাম অর্জুন সাহা, ইনসিওরেন্স শেয়ার এন এস সি, ইত্যাদি নানা ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত। তার প্রচুর ক্লায়েন্ট। তাকে ডেকে একদিন বাড়ির সবাইকে নিয়ে নমিতার জন্য দু'ঘন্টা ধরে কনফারেন্স করেছেন। কীভাবে, কোথায় ইনভেস্ট করলে তার ভবিষ্যৎ সুদের টাকায় সুরক্ষিত থাকবে, তাকে কারও গলগ্রহ হতে হবে না—এই নিয়ে চুলচেরা আলোচনার পর স্থির হয়েছে কিছু টাকা পোস্ট অফিসে রাখা হবে আর কেনা হবে পঞ্চাশ হাজার টাকার এন এস সি। পোস্ট অফিস থেকে আপাতত ইন্টারেস্ট তোলা হবে না। সেগুলো বাড়তে

থাকবে। কৃষ্ণকিশোর যতদিন বেঁচে আছেন, নমিতার চিন্তা নেই। তাঁর মৃত্যুর পর সে মাসে মাসে সুদ তুলবে।

নান্টু, নমিতা আর রাজেশ্বরীর ব্যবস্থাও পাকা করে ফেলেছেন কৃষ্ণকিশোর। কিন্তু সুতপা সম্পর্কে এখনও টুঁ শব্দটি করেন নি। এ নিয়ে কী ভাবছেন, বোঝার উপায় নেই। সুতপা অবশ্য যথারীতি মির্জাপুরে গিয়ে কম্পোজ করে চলেছে।

আজ রবিবার। সপ্তাহের অন্য দিনগুলো আটটা বাজতে না বাজতেই চান সেরে নাকেমুখে চাট্টি গুঁজে ঊর্ধ্বশ্বাসে সুতপাকে বেরিয়ে পড়তে হয়। ফিরতে ফিরতে ছ'টা সাড়ে-ছ'টা ওভারটাইম থাকলে সাড়ে-আটটা ন'টা। দিনের বারো তেরো ঘন্টা সময় বাইরে বাইরেই কেটে যায় তার। দৌড়ঝাঁপ এবং হাড়ভাঙা খাটুনির পর যখন সে বাড়ি ফেরে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট থাকে না। মনে হয়, সব এনার্জি কেউ শুষে নিয়েছে।

সপ্তাহের ছ'দিন শরীরে যে ক্ষয় হয়, রবিরারটা আয়েস করে সেটা পূরণ করতে চায় সুতপা। এই দিনটায় কোনও তাড়া নেই। তাই ওঠে অনেক বেলা করে। চা'টা খেয়ে নমিতাকে রান্নাঘরে গিয়ে একটু সাহায্য করা, রাজেশ্বরীকে ওষুধ খাওয়ানো, এই রকম টুকিটাকি হালকা ঘরের কাজ। তারপর অনেকটা সময় ধরে চান। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে সটান বিছানায়। টানা তিন চার ঘন্টা পরিপাটি একটি দিবানিদ্রা না হলেই নয়।

অন্য রবিবারের মতো সারা দুপুর ঘুমোবার পর এইমাত্র জেগেছে সুতপা। চোখ ফোলা ফোলা সামান্য লালচে। ঘুম ভাঙলেও বিছানা থেকে নামার তিলমাত্র ইচ্ছা নেই তার।

ঘরের দেওয়ালে একটা সাবেক কালের ঘড়ি লোহার হুকে আটকানো। সেটাতে এখন পাঁচটা বেজে বেয়াল্লিশ। মাথার ওপর চার ব্লেডের সিলিং ফ্যানটা ঘটাং ঘটাং আওয়াজ তুলে ঘুরে যাচ্ছে।

সারা দুপুর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মে মাসের গনগনে সূর্যের ঝাঁঝ অনেক কমে গেছে। সেটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিম দিকের উঁচ উঁচু বাড়িগুলোর আড়ালে নেমে গেছে। বাতাসও ক্রমশ জুড়িয়ে আসছে।

এই গরমে আকাশের দিকে তাকানো যায় না। তার গায়ে তপ্ত কাঁসার রং লেগে থাকে। এখন মনে হয়, সারা আকাশ জুড়ে কেউ স্বর্ণরেণু ঢেলে দিচ্ছে।

বালিশে বুক চেপে বাইরে তাকিয়ে ছিল সুতপা। তার ঘর থেকে বাড়ির ভেতরকার অনেকটা অংশ চোখে পড়ে।

জয়নাল এবং তার বাহিনী ক'দিন হল কাজ শুরু করেছে। এখন বাইরে মেরামতি চলছে। 'মহামায়া ধাম'-এর আদ্যিকালের শ্যাওলা-ধরা, নোনা-লাগা

ছালচামড়া ছাড়িয়ে নতুন প্ল্যাস্টার করা হচ্ছে। প্লাম্বাররা জং-ধরা ভাঙাচোরা রেন-ওয়াটার পাইপগুলো বদলে নতুন মজবুত পাইপ বসাচ্ছে। সারা বাড়ি জুড়ে হাতুড়ি ঠোকা, আস্তর লাগানো, ইত্যাদির তুমুল আওয়াজ। নিচে দাঁড়িয়ে হাঁকডাক করে কৃষ্ণকিশোর কাজকর্ম তদারক করছেন। তাঁর পরনে লুঙ্গি এবং হাফ-হাতা পাঞ্জাবি। ঘামে পাঞ্জাবিটা গায়ে লেপটে রয়েছে।

সদর দরজাটা খোলা। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি এসে সেখানে থামল। সেটা থেকে নামল পরিমল এবং নন্দিনী। অর্থাৎ কৃষ্ণকিশোরের বড় ছেলে এবং বড় বউমা। স্বচক্ষে দেখেও প্রথমটা বিশ্বাস হল না সুতপার। অপার বিস্ময় নিয়েই তড়িৎস্পৃষ্টের মতো লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল। ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে বারান্দা পেরিয়ে তর তর করে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ছোটদি, মা, নান্টু—বড়দা আর বড় বউদি এসেছে—'

নিচে পৌঁছুবার আগেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে পরিমল আর নন্দিনী বাড়ির ভেতর চলে এসেছে। পরিমলের হাতে মস্ত পলিব্যাগে প্রচুর ফল আর নন্দিনীর হাতে মিষ্টির বিরাট বাক্স।

সুতপার চেঁচামেচি শুনে নমিতা আর নান্টুও নিচে চলে এসেছে। রাজেশ্বরী নামেন নি, তেতলার বারান্দায় এসে ঝুঁকে সমানে বলে চলেছেন, 'ওদের ওপরে নিয়ে আয়, ওপরে নিয়ে আয়—' স্পেশালিস্টদের দিয়ে নতুন করে চিকিৎসায় সুফল পাওয়া গেছে। এখন তিনি অনেকটাই সুস্থ। গলার স্বর আর ক্ষীণ নেই, প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

পরিমলের বয়স চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। একসময় বেশ সুপুরুষই ছিল কিন্তু এখন শরীর ভারী হয়ে গেছে। চওড়া কপাল। চুল পাতলা হয়ে মাথার মাঝখানে টাক পড়েছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। চোখে চশমা। পরনে দামি ট্রাউজার্স আর শার্ট। নন্দিনীর বয়স চল্লিশ একচল্লিশ। এই বয়সেও বেশ সুন্দরী। গায়ের রং টকটকে। তবে স্বামীর মতোই মেদ জমে জমে চেহারার ছিপছিপে ধারাল ভাবটা আর নেই। চোখে তারও চশমা। পরনে মেরুন রঙের সিল্ক, ওই রঙেরই ম্যাচ-করা ব্লাউজ। মাথার আধাআধি পর্যন্ত ঘোমটায় ঢাকা।

এদিকে কৃষ্ণকিশোর তত্ত্বাবধান স্থগিত রেখে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর কপালে এবং ভুরুতে অজস্র কুঞ্চন। পরিমল আর নন্দিনী পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'হঠাৎ কী মনে করে?' তাঁর কণ্ঠস্বর আবেগহীন, নীরস।

মিনমিনে সুরে পরিমল বলল, 'এই মানে—'

রাজেশ্বরী অধীর হয়ে উঠেছেন। তাঁর কাছে পরিমলদের নিয়ে যাবার জন্য অনবরত ব্যগ্র সুরে তাড়া দিয়ে যাচ্ছেন।

মুখ তুলে কৃষ্ণকিশোর ধমকের সুরে বললেন, 'অত চেঁচিও না। শরীরটা কি আবার খারাপ করতে চাও? এসেছে যখন নিশ্চয়ই যাবে। তুমি ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো।' মুখ নামিয়ে পরিমলদের দিকে তাকালেন, 'মায়ের প্রাণ। না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত স্থির থাকতে পারছে না। এত ডাকাডাকি করছে। যাও। মিস্তিরিদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আমি একটু পরেই ওপরে আসছি।'

পরিমলরা আসায় কৃষ্ণকিশোর যে আদৌ খুশি হন নি, বরং অত্যন্ত বিরক্ত, সেটা তাঁর হাবভাবে, কথাবার্তায়, রুক্ষ চাউনিতে খুবই স্পষ্ট। সেই চরম দুঃসময়ে অর্থাভাবে সংসার যখন ধুঁকছে, স্ত্রী শয্যাশায়ী, দিশেহারা হয়ে দুই ছেলের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। কিন্তু কারও কাছ থেকে একটি সিকি পয়সাও পান নি। সেই থেকে রাগে অভিমানে বিতৃষ্ণায় বড়, মেজ দুই ছেলের নাম কখনও মুখে আনেননি। নিজের জীবন থেকে তাদের পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছেন।

সুতপা বাবার ভাবগতিক আঁচ করতে পারছিল। কৃষ্ণকিশোর এমনিতে শান্ত, নির্বিরোধ, ভালমানুষ। কিন্তু দুই ছেলের এবং তাদের স্ত্রীদের প্রতি এতটাই রুষ্ট যে পরিমল এবং নন্দিনীকে দেখে যে কোনও মুহূর্তে ফেটে পড়তে পারেন। বাড়িতে মিস্তিরির দঙ্গল কাজ করছে। খোলা সদর দরজার বাইরের রাস্তায় প্রচুর লোকজন। এর মধ্যে কৃষ্ণকিশোর যদি উত্তেজনার বশে চিৎকার শুরু করে দেন, একটা ভীষণ বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। সেটা কোনওভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়।

বাইরের লোকের কাছে সংসারের তিক্ত, কটু দিকগুলো রাগের মাথায় বাবা হাট করে দিন, সুতপা তার সুযোগ দিল না। ব্যস্তভাবে পরিমল এবং নন্দিনীকে নিয়ে তেতলায় মায়ের ঘরে নিয়ে গেল। নমিতা আর নান্টুও ওদের সঙ্গে এসেছে।

কৃষ্ণকিশোরের ধমকে রাজেশ্বরী আগেই ঘরে ঢুকে বিছানায় বসে অপেক্ষা করছিলেন। পরিমলদের দেখে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিলমাত্র বিরূপতা বা ক্রোধ নেই। সুতপাদের বললেন, 'ওরে, ওদের বসতে দে—'

ঘরের কোনায় দু-তিনটে চেয়ার আছে। নান্টু সেগুলো খাটের কাছে টেনে নিয়ে এল।

পরিমল আর নন্দিনী কিন্তু চেয়ারে বসল না। একটা চেয়ারে ফল আর মিষ্টির ব্যাগগুলো রেখে রাজেশ্বরীকে প্রণাম করে তাঁর দু'পাশে আলগোছে বসে পড়ল। সুতপারা দাঁড়িয়ে রইল।

বড় ছেলে এবং তার স্ত্রীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে রাজেশ্বরী বলতে লাগলেন, 'কেমন আছিস বড় খোকা? কেমন আছ বড় বউমা?'

পরিমল বলল, 'মোটামুটি চলে যাচ্ছে। তোমার কথা বল। শুনেছিলাম, ভীষণ শরীর খারাপ হয়েছিল?'

এতদিন ভুগেছেন, শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন, ছেলে বউ একবারও এসে দেখে যায় নি। সে জন্য ক্ষোভ নেই, অনুযোগ নেই। নেই সামান্য অভিমানও। উজ্জ্বল হাসিমুখে বললেন, 'মরতেই বসেছিলাম। তোর বাবা বড় বড় ডাক্তার এনে দেখিয়েছে। শরীরের কত রকম পরীক্ষা হল। দামি দামি ওষুধ খাচ্ছি, ভাল ভাল পথ্য পেটে পড়ছে। মেজ খুকি, ছোট খুকি আর নান্টু কত সেবাযত্ন করছে। অনেক ভাল আছি বাবা।'

মায়ের রোগমুক্তির.ব্যাপারে তার যে আদৌ ভূমিকা নেই, সে জন্য মলিন মুখে নীরবে বসে থাকে পরিমল। সুতপা তাকে লক্ষ করছিল। তার এই বড় ভাইটির মধ্যে অপরাধবোধ জেগেছে কি ?

'আমার দাদাভাই আর দিদিভাইকে নিয়ে এলি না কেন?' পরিমলের এক ছেলে, এক মেয়ে। তাদের কথাই জিজ্ঞেস করলেন রাজেশ্বরী।

নিচু গলায় পরিমল বলে, 'সন্ধেবেলায় ওদের টিউটর আসে, তাই আনি নি। আরেক দিন নিয়ে আসব।'

রাজেশ্বরী নমিতাকে বললেন, 'দাদা বউদি এসেছে। নিচে গিয়ে লুচি ভাজ। বেগুনও ভাজিস। আলুর তরকারিও করিস। কাল ক্ষীরের পানতুয়া আর সন্দেশ এসেছিল না?'

'হ্যাঁ।'

'আছে তো?'

'অনেক।'

'সব গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে আসবি। পরে চা করিস। নান্টুকে সঙ্গে নিয়ে যা। ও তোর সঙ্গে হাত লাগালে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। ছোট খুকি এখানেই থাক।'

নান্টু মাঝখানে আড্ডাবাজ হয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বাড়ির কাজও অনেক করত। এখনও করে। রান্নাবান্নার দিকেও ঝোঁক আছে। নতুন করে পড়াশোনা শুরু করার পর 'গণেশ কেবিন'-এর দিকে পারতপক্ষে পা বাড়ায় না। এখন হয় কলেজ, নইলে বাড়ি।

নান্টু আর নমিতা চলে যাবার পর পরই কৃষ্ণকিশোর ঘরে ঢুকলেন। সুতপা দেখল, পরিমল আর নন্দিনী খুব জড়সড় হয়ে গেছে।

একটা ফাঁকা চেয়ারে বসতে বসতে কৃষ্ণকিশোরের নজরে পড়ল, সেটার পাশের চেয়ারে ফল মিষ্টির ব্যাগগুলো রয়েছে। বললেন, 'নিচেই দেখেছিলাম, এগুলো নিয়ে এসেছ। এখন আর এসবের দরকার নেই। ওই দেখ—'রাজেশ্বরী খাটের শিয়রের কাছে একটা মস্ত সেকেলে টেবল। সেটার ওপর প্রচুর ওষুধ বিষুধ এবং স্তূপাকার ফল। সেই দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন কৃষ্ণকিশোর, 'স্বীকার করছি,

কিছুদিন আগে ফলটল আনলে মনে হতো স্বর্গ হাতে পেলাম। কেনার তো ক্ষমতা ছিল না।' একটু দম নিয়ে ফের শুরু করলেন, 'অনেক মিষ্টিও এনেছ। তোমার মা বছর চারেক হল মিষ্টি খায় না। মেজ খুকি, ছোট খুকি আর নান্টু খায়। এখন বাড়িতে মিষ্টির ছড়াছড়ি। রোজই কিছু না কিছু আসছে। যাবার সময় ওগুলো তোমরা নিয়ে যেও। এখানে থাকলে হয় নষ্ট হবে, নইলে বিলিয়ে দিতে হবে।'

রুষ্ট মুখে রাজেশ্বরী বললেন, 'কথার কি ছিরি! হাতে করে যখন এনেছে তখন থাকবে।'

দু'হাত উলটে দিয়ে মুখের অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করলেন কৃষ্ণকিশোর। ব্যঙ্গ? বিদ্রূপ? নাকি অন্য কিছু? সে যা-ই হোক, বললেন, 'যা বলেছি, ঠিকই বলেছি। মায়ের সেন্টিমেন্টে ঘা দিতে চাই না। তুমি যখন বলেছ ফল মিষ্টি থাকবে তো থাকুক।'

একটু চাপচাপ।

এবার কৃষ্ণকিশোর সোজাসুজি পরিমলের চোখের দিকে দৃষ্টি স্থির করলেন, 'তারপর কত বছর বাদে 'মহামায়া ধাম'-এ তোমাদের পদধূলি পড়ল?'

পরিমল তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। ঘাড় ভেঙে তার মাথা বুকের ওপর নুয়ে পড়ল।

কৃষ্ণকিশোর তাঁর নজর সরান নি। বলতে লাগলেন, 'তখন জবাবটা দাও নি। এবার দেবে কি? এতদিন পর আমাদের মনে পড়ল কেন?'

পরিমল এক সময়ের মেধাবী ছাত্র, ইঞ্জিনিয়ার, নাম-করা কোম্পানির বেশ উঁচু পোস্টে আছে। কৃষ্ণকিশোরের মতো সেকেন্ড ডিভিসনে সেকালের আই. এ পাশ একজন শীর্ণ, ভঙ্গুর চেহারার বৃদ্ধের প্রশ্নটার উত্তর দিতে গিয়ে তার কালঘাম ছুটে গেল, 'এই নানা কাজে এত—' কথা শেষ করে না সে।

কৃষ্ণকিশোর শ্লেষের সুরে বললেন, 'তুমি দেখছি দেশের প্রাইম মিনিস্টারের চেয়েও ব্যস্ত হে—'

পরিমল চুপ করে থাকে। সেই যে সে মুখ নামিয়েছিল আর তোলে নি।

কৃষ্ণকিশোর বলতে লাগলেন, 'তোমাদের লেক গার্ডেনস থেকে চেতলার এই নরেশ আড্ডি রোড তো মঙ্গল গ্রহের চাইতেও দূরে। এখানে পৌঁছতে কয়েক বছর লেগে গেল, তাই না?'

পরিমলদের দেখার পর থেকে একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষ্ণকিশোর। উগরে দিচ্ছেন দীর্ঘকালের জমানো ক্ষোভ, রোষ, অসন্তোষ। সেটা ভাল লাগছে না রাজেশ্বরীর। খুব অস্বস্তি বোধ করছিলেন। বিরক্তির সুরে বললেন, তখন থেকে কী শুরু করেছ, বল তো! একটু চুপ করবে?'

সুতপাও স্বস্তি পাচ্ছিল না। বলল, 'তুমি থামো বাবা—'

নমিতা আর নান্টু প্লেট বোঝাই করে লুচি তরকারি মিষ্টি নিয়ে এসেছে। খাটেই খবরের কাগজ বিছিয়ে নন্দিনী এবং পরিমলের সামনে সে-সব সাজিয়ে দিল ওরা।

কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'ঠিক আছে। এই মুখ বন্ধ করলাম।'

এতকাল বাদে ছেলে, ছেলের বউ এসেছে, কিন্তু পুনর্মিলনটা সুখকর হচ্ছে না। আবহাওয়া কেমন যেন ভারী। নিরানন্দ। উচ্ছ্বাসহীন।

রাজেশ্বরী সস্নেহে বললেন, 'খা বাবা, বউমা খাও—'

পরিমল জানালো, এখন খাওয়ার ইচ্ছে নেই। নন্দিনী কিছুই বলল না।

কৃষ্ণকিশোর বলেছিলেন, মুখ বন্ধ করে রাখবেন কিন্তু রাখা গেল না। অনেকটা সহজ সুরে বললেন, 'খাও, খাও। ছোটভাইবোনরা কষ্ট করে খাবারগুলো তৈরি করেছে। না খেলে ওরা কষ্ট পাবে।'

আর আপত্তি করল না পরিমল। বলল, 'আমরাই শুধু খাব। আর সবাই?'

সুতপারা জানায় আজ অনেক বেলায় দুপুরের খাওয়া হয়েছে। শরীর এখনও আইঢাই করছে। তার ওপর খেলে কষ্ট হবে।

পরিমল তার নন্দিনী খাওয়া শুরু করে। তার মধ্যে কথাও চলছে। সে-সব তেমন জরুরি নয়।

একসময় নমিতা চা করে নিয়ে আসে। সেটা সবার জন্য।

সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। সূর্য কখন ডুবে গেছে, কেউ খেয়াল করে নি। রোদের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। বাইরের সব কিছু ঝাপসা। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গেছে। সুতপা আলো জ্বালিয়ে দিল।

খাওয়ার সময় টুঁ শব্দটিও করেননি কৃষ্ণকিশোর। চা-পর্ব শেষ হলে পরিমলকে বললেন, 'লেক গার্ডেনসে বসে টাকার গন্ধটা কী করে পেলে?'

পরিমল হকচকিয়ে গেল, 'মানে?'

'সোজা ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না? আমি যে মোটা টাকা পেয়েছি, সেই খবরটা কীভাবে জানলে?'

পরিমল উত্তর দিল না। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণকিশোর বলতে লাগলেন, 'ধরেই নিচ্ছি, কবে টাকাগুলো পাই সেদিকে তোমাদের নজর ছিল। এরিয়ারটা না পেলে এ-বাড়িতে নিশ্চয়ই আসতে না—কী বল?'

পরিমলের গলার ভেতর অদ্ভুত, কাঁপা কাঁপা একটা শব্দ হল।

রাজেশ্বরী রাগের সুরে বললেন, 'ফের তুমি শুরু করলে?'

কৃষ্ণকিশোর স্ত্রীকে দাবড়ে দিলেন, 'কথার ভেতর কথা বলো না। চুপ করে থাকো।' বলে পরিমলের দিকে ফিরলেন, 'ধানাইপানাই করার দরকার নেই। যে

উদ্দেশ্যে এসেছ সেটা সোজাসুজি অল্প কথায় বলে ফেল। জয়নালদের কাজ আজকের মতো হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ওয়েট করছে। ওদের কিছু টাকা দিতে নিচে যেতে হবে।'

পরিমল ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলে গিলে জানালো, লেক গার্ডেনসেই সে অফিস আর ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে একটা ফ্ল্যাট কিনেছে। ওই টাকাতে হয় নি, বন্ধুদের কাছ থেকেও ধার করতে হয়েছে। অফিস ফি মাসে মাইনে থেকে মোটা টাকা কাটছে। ব্যাঙ্ককেও তিন মাস পর পর সুদসমেত প্রচুর টাকার ইনস্টলমেন্ট দিতে হচ্ছে। বন্ধুরাও ঋণ শোধ করার জন্য ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলেছে। এদিকে সংসারের প্রচণ্ড খরচ। নাম-করা যে মিশনারি স্কুলে ছেলে আর মেয়ে পড়ে সেখানে বিরাট অঙ্কের টুইশন ফী দিতে হয়। তা ছাড়া প্রাইভেট টিউটর, কাজের লোকের মাইনে, ইত্যাদি ইত্যাদি। চোখে মুখে একেবারে অন্ধকার দেখছে পরিমল। এখন বাবা যদি লাখ দেড়েক টাকা দেন, সে খানিকটা সামলে নিতে পারবে। নইলে ফ্ল্যাটটা হাতছাড়া হয়ে যাবে।

আপাদমস্তক বড় ছেলেকে তীক্ষ্ণ চোখে একবার পর্যবেক্ষণ করলেন কৃষ্ণকিশোর। তারপর খুব ধীরে ধীরে বললেন, 'ধর, আমি যদি টাকাটা না পেতাম, তোমার সমস্যার সমাধান কীভাবে হতো?'

পরিমল কী উত্তর দেবে? সে মুখ বুজে বসে থাকে।

কৃষ্ণকিশোর এবার ছেলের দিকে ঝুঁকলেন, 'আমার স্মৃতিশক্তি এই বয়েসেও নষ্ট হয়ে যায় নি। তুমি হয়ত ভুলে গেছ, কিংবা না-ও ভুলতে পার, তবু বলছি। ক'বছর আগে তোমাদের মায়ের হার্ট অ্যাটাক হল, নান্টুকে কলেজ থেকে ছাড়িয়ে আনলাম, আমার অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। পাগলের মতো তোমাদের কাছে ছুটে গিয়েছিলাম একটু সাহায্যের আশায়। কী করেছিলে তুমি? কী বলেছিলে? মনে পড়ছে?'

ঘাড় ভেঙে বুকের ওপর ঝুলে পড়ে পরিমলের।

কৃষ্ণকিশোর থামেন নি, 'মেজ খুকি, ছোট খুকি, নান্টু—আমার অন্য ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করে তোমাকে আর সন্তুকে বড় স্কুল, বড় কলেজে পড়িয়েছিলাম। তোমাদের খরচ যোগাতে গিয়ে নিজেরা ভাল করে খাইনি, নান্টুরা সস্তা জামাকাপড় পরে কাটিয়ে দিয়েছে। তোমাদের মায়ের সেরকম ট্রিটমেন্ট করাতে পারি নি। করলে মহিলাকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হতো না।' একটু থেমে ফের বললেন, 'আমাদের আরেকটু স্বার্থপর হওয়া উচিত ছিল।'

হতবাক সুতপা বাবাকে দেখছিল। দেখেই যাচ্ছিল। পলকহীন। এমন নিরীহ, শান্ত মানুষটা যে এমত কটু, কঠোর ভাষায় বলতে পারেন, ভাবা যায় নি।

কৃষ্ণকিশোর ছেলেকে ছেড়ে এবার ছেলের বউকে নিয়ে পড়েন, 'আমার ছেলে

ওই রকম। তোমাকে আর কী বলব মা! তবু একটু কিছু না বললেই নয়। বিয়ের পর মাত্র তিনটে মাস এ-বাড়িতে এসে ছিলে। পাছে শ্বশুরবাড়ির গুষ্টিকে খাওয়াতে হয়, তোমাদের সুখের আরামের ব্যাঘাত ঘটে তাই স্বামীকে নিয়ে চলে গেলে। মনে পড়ে?'

নন্দিনী নীরব।

কৃষ্ণকিশোর বলতে লাগলেন, 'আবার এ-বাড়িতে আসার দরকার হবে, এটা বোধহয় ভাবতে পার নি, তাই না?'

নন্দিনীর মুখ ছাইবর্ণ হয়ে যায়।

কৃষ্ণকিশোর থামেন নি, 'তুমি পরের মেয়ে। তোমাকে দোষারোপ করে কী হবে? আমার ছেলে যদি সত্যিকারের মানুষ হতো, বাপ-মা-ভাই-বোনের প্রতি এতটুকু দায়িত্ববোধ থাকত, এ-বাড়ি থেকে তাকে নিয়ে যাবার ক্ষমতা তোমার হতো না।'

ঘরের ভেতর স্তব্ধতা নেমে আসে।

বেশ কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণকিশোর ফের পরিমলের দিকে তাকাল, 'অনেকদিন পর এ-বাড়িতে এলে। আমাদের দেখে গেলে। আমরাও তোমাদের দেখলাম। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হলে আসতে পার।' একটু থেমে বললেন, 'তবে বিশেষ কোনও আশা নিয়ে এস না।'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। এরপর পরিমলরা যদি আবার আসেও, শত কাকুতি মিনতিতেও একটি পয়সা দেবেন না।

আট

আরও দু'সপ্তাহ কেটে যায়।

টাকার তো অভাব নেই। যখন যে জিনিসের দরকার তক্ষুনি তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন কিষ্ণকিশোর। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জয়নালরা মেরামতি চালিয়ে যাচ্ছে। কেন না জুন মাস পড়ে গেছে। ক'দিন পরেই বর্ষা নেমে যাবে। তার আগে বাড়ির বাইরের দিকের কাজটা তারা শেষ করে ফেলতে চায়। বৃষ্টিতে খোলা জায়গায় সিমেন্ট-বালির কাজ করতে ভীষণ অসুবিধা।

আজও একটা রবিবার। ছুটির দিন।

এখন আটটার মতো বাজে। এর মধ্যেই রোদের তাপ বাড়তে শুরু করেছে। জয়নালরা খিদিরপুর থেকে এসে কাজে লাগতে লাগতে দশটা, সোয়া দশটা।

ইদানীং রোজই কৃষ্ণকিশোর আর রাজেশ্বরীর ঘরে বিকেলের চায়ের আসর বসে। আজও বসেছিল।

নিচের ফাঁকা জায়গায়টা থেকে হঠাৎ ডাক ভেসে আসে, 'মা, বাবা, নান্টু, মেজ খুকি, ছোট খুকি—'

চা খেতে খেতে সবাই গল্প করছিল। একটু অবাক হয়ে কৃষ্ণকিশোর কান খাড়া করলেন। খুব সম্ভব গলার স্বরটা চেনার চেষ্টা করছেন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'তোমার মেজপুত্তুর —সন্তু।'

রাজেশ্বরী অস্থির হয়ে উঠলেন, 'ওরে, কেউ গিয়ে ওকে ওপরে নিয়ে আয়।'

ততক্ষণে নান্টু দৌড়ে বেরিয়ে গেছে। দু'মিনিট কাটল না, সন্তু অর্থাৎ সুভাষকে নিয়ে এল। সুভাষ একাই এসেছে। স্ত্রী মাধবীকে সঙ্গে আনে নি। কিংবা নিজেই সে আসে নি। বিয়ের পর যেভাবে মাত্র একটা দিন শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়ে স্বামীকে নিয়ে সে চলে গিয়েছিল, তার স্মৃতি খুব সুখকর নয়। 'মহামায়া ধাম'-এ এতদিন বাদে অভ্যর্থনাটা কেমন হবে সেটা ভেবে খুব সম্ভব তার আসতে সাহস হয়নি। তবে সুভাষ এ-বাড়ির ছেলে। সে এলে কৃষ্ণকিশোররা রাগারাগি করতে পারেন, বিরক্ত হতে পারেন, কিন্তু ঘাড়ধাক্কা দিয়ে নিশ্চয়ই বার করে দেবেন না। এখন কৃষ্ণকিশোর আর নিঃস্ব নন। তাঁর নুয়ে-পড়া শিরদাঁড়া আবার শক্ত হয়ে উঠেছে। যে মেয়ে তাঁর ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, মিলিওনেয়ার শ্বশুর তাকে নিশ্চয়ই রেয়াত করবেন না। হয়ত এই রকমই ভেবে থাকবে সে।

পরিমলের মতো সুভাষও প্রচুর ফল আর মিষ্টি নিয়ে এসেছিল। সেগুলো যে-টেবলে রাজেশ্বরীর ওষুধপত্র এবং ফল টল থাকে তার একধারে রেখে মা-বাবাকে প্রণাম করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

সুভাষ পরিমলের মতো মুটিয়ে যায় নি। শ্যামবর্ণ, ছিপছিপে চেহারা তার। নাকমুখ কাটা কাটা। ঘন চুল ব্যাক-ব্রাশ করা। পরনে ট্রাউজার্স আর বুশ শার্ট। বয়স সাঁইত্রিশ আটত্রিশ।

সুভাষের আনা ফল মিষ্টির পাতলা ব্যাগগুলোর দিকে নিস্পৃহভাবে একবার তাকালেন কৃষ্ণকিশোর। পরিমলের বেলায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। এখন তেমনটা ঘটল না। খুব ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার আসতে এত দেরি হল যে?'

বুঝতে না পেরে হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইল সুভাষ।

কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'আমার কথাটা বোধ হয় ধরতে পারো নি। ঠিক আছে, বুঝিয়ে দিচ্ছি। দু'সপ্তাহ আগে তোমার দাদা, মানে মন্টু তার বউকে নিয়ে এসেছিল। ভেবেছিলাম, তুমিও খুব তাড়াতাড়ি এসে পড়বে।'

সুভাষ নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'দাদার আসার সঙ্গে আমার আসার কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক একটাই।'

'মানে?'

'মানে হল টাকা — মানি—'

সুভাষ চুপ।

কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'আমি যে সমস্ত বকেয়া টাকা পেয়ে গেছি, দু'সপ্তাহ আগেই লেক গার্ডেন্সে বসে মন্টু তার গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল। তুমি থাকো কাঁকুলিয়া। সেটা তো খুব দূরে নয়। তাই জানতে চাইছিলাম, গন্ধটা পৌঁছতে এত সময় লেগে গেল!'

কৃষ্ণকিশোরের কথায় কিসের পূর্বাভাস সেটা আঁচ করেত পারছিলেন রাজশ্বেরী। তিনি উতলা হয়ে উঠলেন। স্বামীকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সুভাষকে বললেন, 'তুই একা এলি? মেজ বউমা এল না?

সুভাষ উত্তর দেবার আগেই কৃষ্ণকিশোর বলে ওঠেন, 'কী করে আসবে? শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে যা ব্যবহার করে গেছে তাতে এ-বাড়িতে পা ফেলতে লজ্জা নিশ্চয়ই হয়েছে। না কি বল হে—' তিনি সুভাষের দিকে তাকালেন।

হতচকিত সুভাষ মুখ বুজে বসে থাকে।

কৃষ্ণকিশোর গলার স্বর চড়ান না। সেটাকে নিচু পর্দায় রেখে বলতে থাকেন, 'তোমার বড় বউমার চোখে পর্দা নেই। মেজ বউমার আছে। তাই আসে নি। সে যাক গে—' এবার নমিতাদের বলেন, 'এতদিন বাদে তোদের মেজদা এল। চা মিষ্টি টিষ্টি খাওয়া।'

নমিতা বেরিয়ে যাচ্ছিল, সুভাষ বাধা দিল, 'না না, ওসব থাক।'

'তাই কখনও হয়? তুমি একটু কিছু মুখে না দিলে তোমার মা, ভাইবোনেরা দুঃখ পাবে। খাওয়া টাওয়া হয়ে গেলে কাজের কথা হবে।'

'কাজের কথা!' বিমূঢ়ের মতো যেন প্রতিধ্বনি করে সুভাষ।

'পরে বলব। যা মেজ খুকি—'

নমিতা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সুভাষের চা এবং মিষ্টি টিষ্টি খেতে খেতে সাড়ে ন'টা বেজে গেল। এর মধ্যেই রোদ আরও তেতে উঠেছে। তপ্ত বাতাস বইছে বাইরে। তার দু-একটা ঝাপটা খোলা দরজা-জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ছে।

কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'মন্টু সেদিন এসে বললে, অনেক লোন টোন করে একটা ফ্ল্যাট কিনছে। ধার শোধ করতে পারছে না। তাকে দেড় লাখ টাকা না দিলেই নয়। তা তোমার কত টাকা না হলে মান-সম্মান বাঁচবে না?'

রাজেশ্বরী রেগে গেলেন, 'ও কি তোমাকে টাকার কথা বলেছে?'

ডাইনে বাঁয়ে, দু'ধারে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'না। তবে বলত। কিন্তু তার আগে আমিই কথাটা তুললাম।' ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, ঠিক বলেছি?'

মুখ নামিয়ে নিল সুভাষ। বার কয়েক ঢোক গিলে বলল, 'হ্যাঁ।'

কোনও গোপন চক্রান্ত ধরে ফেলার মতো সাফল্যের হাসি ফুটে ওঠে কৃষ্ণকিশোরের মুখে। স্ত্রীকে বললেন, 'কোনও দিন যারা এ-পথ মাড়ায় না, ফলটল নিয়ে তারা হঠাৎ ছোটাছুটি শুরু করেছে কেন? আসল ব্যাপারটা হল ওই চোদ্দ লাখ সাতাত্তর হাজার আটশো টাকা যেটা আমি অফিস থেকে পেয়েছি।'

কৃষ্ণকিশোর আগের দিন পরিমল এবং নন্দিনীকে অনবরত হুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে কথা বলছিলেন। আজ সুভাষকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছেন। কোনওভাবেই ছাড়াছাড়ি নেই। এটা মোটেও পছন্দ হচ্ছিল না রাজেশ্বরীর। অন্যায় তারা করেছে অবশ্যই, তবু তো নিজেদের সন্তান। বাড়িতে যখন এসেছে, তাদের ওপর এতটা নির্মম হওয়া ঠিক নয়। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এবার থামো।'

'থামব তো নিশ্চয়ই। সন্তুর সঙ্গে আর দু-একটা কথা বলে একদম চুপ করে যাব।'

'কী বলবে ওকে?'

স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন না কৃষ্ণকিশোর। ছেলেকে বললেন, 'তুমি তো বহু টাকা স্যালারি পাও। তোমার এত অর্থের সমস্যা কিসের?'

পরিমল যেভাবে বলেছিল তেমনি মিনমিনে সুরে সুভাষ জানায়, তার দুই ছেলেকে দার্জিলিঙে একটা রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে প্রচুর ডোনেশন দিয়ে ভর্তি করে সেখানে রেখে পড়াচ্ছে। সেজন্য মাসে মাসে ন'হাজার টাকা দিতে হয়। তা ছাড়া আনুষঙ্গিক নানা খরচও রয়েছে। তার স্ত্রীর মাধবীর ভীষণ খরচের হাত। বড়লোক বান্ধবীর সঙ্গে মাসে কম করে তিন চার দিন শপিং করতে বেরোয়। এটা কেনে, সেটা কেনে। অনাবশ্যক দামি দামি জিনিসে ঘর বোঝাই করে ফেলেছে। সপ্তাহে অন্তত একদিন বড় হোটেলে নিয়ে খাওয়াতে হয়। পুজোর সময় আনন্দ ভ্রমণ। কোনও বার উটিতে, কোনও বার গোয়ায়, কোনও বার কুলু-মানালিতে। এসবের খরচ জোগাতে জোগাতে জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে সুভাষের। প্রচুর ধার হয়ে গেছে তার। স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়েছে, বুঝে সুঝে আয় অনুযায়ী চলা দরকার। পয়সাওলা বন্ধুদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে আমরা পারব কেন? একদিন মুখ থুবড়ে পড়তে হবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! খরচ কমাবার কথা বলতে গেলে বাড়িতে হুলস্থূল বাধিয়ে দেয় মাধবী। চরম অশান্তি।

এদিকে পাওনাদারদের তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সুভাষ। যারা টাকা ধার

দিয়েছে তারা ছাড়বে কেন? অনেক ঘোরাঘুরির পরে তারা হুমকি দিয়েছে, কোর্টে চলে যাবে। সুভাষের এখন চরম দিশেহারা অবস্থা। নিরুপায় হয়ে তাই মা-বাবার কাছে ছুটে এসেছে।

ছেলের কথার মধ্যে একবারও টুঁ শব্দটি করেন নি কৃষ্ণকিশোর। মুখে নিরাসক্ত ভঙ্গি। ধৈর্যশীল শ্রোতার মতো সব শুনে গেছেন। এবার বললেন, 'দার্জিলিংয়ে রেখে পড়াবার মতো যাদের টাকা নেই তাদের ছেলেরা সব অমানুষ হয়ে যাচ্ছে? কলকাতা শহরে ভাল স্কুলের অভাব হয়েছে বলে তো শুনিনি কখনও। ফাইভ-স্টার হোটেলে খাওয়া, শপিং, ছুটিতে দূরে দূরে বেড়ানো—এসব ছাড়া জীবন বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায়?'

সুভাষ চুপ করে থাকে।

কৃষ্ণকিশোর একবার যখন মুখ খোলেন, সহজে থামেন না। তিনি বলতে লাগলেন, 'স্ত্রীকে দোষারোপ করে কী লাভ? নিশ্চয়ই তোমারও এতে আশকারা ছিল। প্রথম প্রথম চালাতে পেরেছ। যত দিন যাচ্ছে তোমার খরচের হাত তত লম্বা হচ্ছে। এখন চোখে অন্ধকার দেখছ। বুঝলে বাবা, পয়লা রাতেই বেড়াল মারতে হয়। লাগামটা যদি গোড়া থেকেই টেনে রাখতে, এই ঝঞ্ঝাটে পড়তে হতো না। আসলে ব্যাপারটা কী জানো বাবা—'

চোখ তুলে বাবার দিকে তাকায় সুভাষ।

কৃষ্ণকিশোর বলেন, 'তোমরা সোশাল স্টেটাস বাড়াতে চেয়েছিলে। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা। মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে জন্ম। কত কষ্ট করে মানুষ করেছি তোমাদের দু'ভাইকে। ভাল একটা চাকরি পেয়ে, বড়মানুষ বন্ধুদের দেখে রাতারাতি উড়তে গেলে। তার ঠেলা তো সামলাতেই হবে।'

সুভাষ এবারও কিছু বলে না।

কৃষ্ণকিশোর বলেই চলেন, 'তা ঋণটা কত টাকার হয়েছে? সুদ-আসল মিলিয়ে?'

গলার কাছটা কাঁপতে থাকে সুভাষের। বাবা যখন ধারের পরিমাণটা জানতে চেয়েছেন, তখন হয়ত আশা আছে। একরকম মরিয়া হয়েই বলল, 'দু'লাখ টাকার ওপরে।'

কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'তোমার দাদার লোন দেড় লাখের বেশি। তোমারও দু'লাখের ওপরে। ধারের ব্যাপারে কেউ কম যাও না—'

নিচ থেকে জয়নালের ডাক শোনা যায়, 'বাবু, আমরা এসে গেছি—'

হাতের ইশারায় সুভাষকে একটু অপেক্ষা করতে বলে বারান্দার বাইরে চলে যান কৃষ্ণকিশোর। রেলিংয়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে বলতে থাকেন, 'তোমরা কাজে

লেগে যাও। আমি এক্ষুনি আসছি—' কী কী করতে হবে, সব ওদের বুঝিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে এলেন, কিন্তু বসলেন না। 'মিস্তিরিরা এসে গেছে। আমার ভীষণ তাড়া। নিচে গিয়ে কাজকর্ম দেখাশোনা করতে হবে। তা তোমার সমস্যার কথা সব শুনলাম। মন্টুকে যা বলেছিলাম, তোমাকেও তাই বলছি। আমার কাছে কিছু আশা করো না। আমাকে জিজ্ঞস করে ধার নাও নি। তোমার প্রবলেমের ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। যে ক'টা টাকা পেয়েছি তা দিয়ে তোমাদের দুই ভাইয়ের ঋণশোধ করতে পারব না। আমরা যে ক' জন এ-বাড়িতে আছি তাদের ভবিষ্যতের কথা তো ভাবতে হবে।' বলে আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না, বেরিয়ে গেলেন। মিস্তিরিদের কাজকর্ম দেখাশোনা করতে হবে। সুভাষকে যা বলার বলে দিয়েছেন। ছেলে অবশ্য সহজে ছাড়তে চাইবে না। নতুন করে কাঁদুনি গাইতে শুরু করবে কিন্তু সে-সব শোনার মতো সময় তাঁর নেই।

নয়

আরও দু-আড়াই মাস কেটে যায়।

গ্রীষ্মের পর বর্ষাও প্রায় শেষ হয়ে এল। মাঝে মাঝে আকাশের এ-কোনা ও-কোনা কালো মেঘে ছেয়ে যায়। ঝমঝম দু-চার পশলা বৃষ্টি হবার পর আকাশ ঝকঝক করতে থাকে। মনে হয়, মহাশূন্যে কেউ বুঝি নীল শমিয়ানা টাঙিয়ে দিয়েছে। শরৎ ঋতু এসে পড়ল বলে। বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ।

জুনের গোড়ার দিকে 'মহামায়া ধাম'-এর বাইরের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ঘোর বর্ষায় ভেতরের কাজে অসুবিধে নেই। তাও অনেকটাই হয়ে গেছে।

দোতলা-তেতলার শোবার ঘর, বাথরুমের পুরনো প্ল্যানে কোনও হেরফের ঘটানো হয় নি। শুধু শোবার ঘরগুলোর মেঝে মোজেক করা হয়েছে, দেওয়াল চেঁছে ফেলে লাগানো হয়েছে প্ল্যাস্টার অফ প্যারিস। বাথরুমগুলোতে এখন টাইলস, শাওয়ার, কমোড ইত্যাদি। একতলার কিচেন এবং খাওয়ার ঘরের প্ল্যান আগের মতো রেখে, অনেক তাক টাক বসিয়ে নতুন চেহারা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আর যে দু'টো ঘর সারা বছর ফাঁকা পড়ে থাকে তার পুরনো প্ল্যান কিন্তু একেবারে বদলে দিচ্ছেন কৃষ্ণকিশোর। দুই ঘরের মাঝখানে দেওয়াল ভেঙে একটা বিরাট হল করিয়েছেন। দু'ধারে এয়ার কন্ডিশনার বসানোর জন্য চৌকো ফোকর করা হয়েছে। কাঠের পাল্লার বদলে পুরু কাচের পাল্লা বসানো হবে।

বাড়ির সবাই ভীষণ অবাক। দোতলা বা তেতলার বেডরুমগুলোতে নয়, একতলার পরিত্যক্ত দু'টো ঘরকে মাঝখানের পার্টিশান ওয়াল ভেঙে কেন একটা

বিশাল হল বানানো হচ্ছে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাই বা কেন, এ-সবের মাথামুন্ডু কেউ বুঝতে পারছে না।

রাজেশ্বরী নমিতা সুতপা নান্টু, সবাই জিজ্ঞেস করেছে, 'এখানে কী করতে চাও তুমি?'

'এখন কিচ্ছু বলব না। ক'দিন ওয়েট কর—' কৃষ্ণকিশোর চোখ কুঁচকে, মিটি মিটি হাসতে হাসতে বলেছেন। তাঁর বলার ভঙ্গি এবং হাসিতে অদ্ভুত এক প্রহেলিকা।

সুতপা বলেছে, 'লোকে শোবার ঘর এয়ার-কুলার টুলার লাগায়। তুমি এখানে লাগাতে চাইছ কেন? তা ছাড়া, আমাদের কাছে ফ্যানই যথেষ্ট। অত বিলাসিতার কী দরকার?'

আগের মতোই হেসে হেসে কৃষ্ণকিশোর বলেছেন, 'এখন আমার মুখ থেকে কিচ্ছু বার করানো যাবে না। পুজোর পরে সব জানতে পারবি।'

এই দু-আড়াই মাস মসৃণ নিয়মে সব চলছে। নান্টু কলেজে যাচ্ছে, নমিতার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তার ডিভোর্সের যে মামলাটা চলছিল, কোর্ট সেটার রায় দিয়েছে। এখন সে সম্পূর্ণ মুক্ত। স্বামীর সঙ্গে নমিতার পাকাপাকি বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। সুতপা আগের মতোই সকালে উঠে 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস'-এ ছুটছে। সন্ধের পর বাড়ি ফিরছে। দীপঙ্করের সঙ্গেও দেখা হচ্ছে। মাঝে মধ্যে কাজের ফাঁকে সময় বার করে দু-একটা সিনেমাও দেখছে।

বকেয়া টাকা পাওয়ার পর প্রথম দিকে সুতপার বিয়ের কথা বলেছিলেন কৃষ্ণকিশোর। একটি সৎপাত্র যোগাড় করে তার হাতে ছোট মেয়েটিকে তুলে দিতে পারলে তিনি ভারমুক্ত হবেন। কন্যাদায়ের চেয়ে বড় দায় তো আর কিছু নেই। নান্টু এবং নমিতার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা হয়েছে। রাজলক্ষ্মীর ভাল চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেছেন। ভাঙাচোরা বাড়ি সারাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন কিন্তু সুতপার বিয়ের ব্যাপারে তাঁর মুখ থেকে আর একটি শব্দও বেরোয়নি। এ-নিয়ে তাঁর আদৌ যে কোনও দুশ্চিন্তা আছে, তা বোঝা যাচ্ছে না।

এই দু-আড়াই মাসে একটাই মাত্র তিক্ত ঘটনা ঘটে গেছে 'মহামায়া ধাম'-এ। কৃষ্ণকিশোর যে অজস্র টাকা পেয়েছেন, এই খবরটা অনেক পরে পেয়েছে তাঁর বড় মেয়ে দীপালি, যার ডাক নাম বড় খুকি। আর পাওয়ামাত্র এক লহমাও দেরি করে নি, সটান বাপের বড়িতে হাজির হয়েছে। 'মহামায়া ধাম'-এ পা দিয়েই সে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিল, 'বাবা, আমি কি তোমার কেউ নই?'

প্রশ্নটার গতি কোন দিকে, আঁচ করতে পারছিলেন কৃষ্ণকিশোর। দীপালির ছুটে

আসার কারণটাও তাঁর কাছে জলের মতো পরিষ্কার। বড় মেয়েকে বহুকাল পর দেখেও কোনও রকম আবেগে ভেসে যান নি। উদাসীন মুখে বলেছেন, 'হবে না কেন? তুমি আমার মেয়ে।'

'তা হলে সুখবরটা পৃথিবীর সবাই জানলো, আর আমিই শুধু বাদ গেলাম?'

'সুখবর মানে আমার টাকা পাওয়ার কথা বলছ তো?'

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়েছে দীপালি।

কৃষ্ণকিশোর বলেছেন, 'টাকার খবরটা তোমাকে জানানো প্রয়োজন মনে করি নি।'

শুকনো গলায় দীপালি বলেছে 'কেন বাবা, সবাই জানলো আর আমি জানতে পারব না?'

'জেনে কী লাভ?'

ঠোঁট দু'টো থর থর কাঁপছিল দীপালির। সে কোনও উত্তর দিতে পারে নি।

কৃষ্ণকিশোর বলেছেন, 'তোমারা তো শ্যামবাজারে থাকো। এই ক' বছরে বুড়ো বাবা-মা, ছোট ভাইবোনদের ক' বার এসে খোঁজ নিয়ে গেছ?'

'না, মানে সংসারের এত ঝঞ্ঝাট! ছেলেমেয়েদের স্কুল, পড়াশোনা—'

'সে সব ঝঞ্ঝাট কি মিটে গেছে, না এখনও আছে?'

বোবার মতো তাকিয়ে থাকে দীপালি।

কৃষ্ণকিশোর এবার বলেছেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, টাকার খবরটা না পেলে তুমি কি এ-বাড়ির ছায়া মাড়াতে?'

উত্তর নেই। তবে দীপালি এমন একটা মেয়ে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে যে-কোনও খোঁচা কি অসম্মান গায়ে মাখে না। মনমরা হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। বাবার চোখা চোখা শ্লেষ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে সে তৎপর হয়ে ওঠে, 'বাবা, তুমি তোমার অন্য ছেলেমেয়েদের এত কিছু দিলে, আমি কিছু পাব না?'

কৃষ্ণকিশোর নিস্পৃহ সুরে কথা বলছিলেন। তাঁর চোয়াল কঠোর হয়ে ওঠে, 'মন্টু সন্তুকে কিছুই দিই নি। টাকার বাজনা কানে যেতে তারা দৌড়ে এসেছিল। খালি হাতে তাদের বিদেয় করে দিয়েছি। তুমিও এক কানাকড়ি পাবে না।'

মুখটা পাংশু হয়ে যায় দীপালির, 'আমরা কী অপরাধ করলাম বাবা?'

'মন্টু সন্তু কী করেছিল সেটা তাদের মনে করিয়ে দিয়েছি। আর তুমি কী করেছ, তা কি ভুলে গেছ?'

'আমি—আমি—' এই পর্যন্ত বলে চুপ করে যায় দীপালি। তার মুখে আর কথা যোগায় না।

'সেই বিয়ের সময় থেকে কীভাবে কতবার আমাকে শুষেছ, মনে পড়ে? মা শয্যাশায়ী, ছোট ভাইবোনদের পড়াশোনা চালাতে পারছি না, অফিস বন্ধ হয়ে গেছে, সে-সব একবারও ভেবে দেখো নি।'

দীপালি চুপ।

কৃষ্ণকিশোর বলেছেন, 'তোমরা বড় তিন ভাইবোন অনেক কিছু আদায় করে নিয়েছ। ছোটগুলোর প্রতি বাবা হিসেবে আমার একটা কর্তব্য আছে। ওরা অবহেলায় মানুষ হয়েছে। ওদেরও তো কিছু দিতে হবে।'

কিছুক্ষণ মোহ্যমানের মতো বসে ছিল দীপালি। তারপর সমস্ত নৈরাশ্য ঠেলে সরিয়ে নতুন উদ্যমে শুরু করে, 'বাবা, বাড়িটা যেভাবে সারিয়ে টারিয়ে নিচ্ছ, চেনাই যায় না। সবটা মেরামত হয়ে গেলে, রং টং করার পর মনে হবে একেবারে নতুন বাড়ি।'

বড় মেয়ের কথাগুলোর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সংকেত ছিল। পলকে সেটা ধরে ফেলেছন কৃষ্ণকিশোর। বলেছিলেন, 'হ্যাঁ। কতদিনের পুরনো বিল্ডিং। ভেঙেচুরে প্রায় বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল। অফিসের টাকাটা পেয়ে গেলাম। তাই রিপেয়ার করা সম্ভব হচ্ছে। এখন বিশ-পঁচিশ বছরের জন্যে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত।'

বাড়ির ব্যাপারে দীপালির মাথায় একটা মতলব পাক খাচ্ছিল। সাহস করে সেটা বলতে পারিছল না সে। শেষ পর্যন্ত বার কয়েক ঢোক গিলে ডেকেছে, 'বাবা—'

'কী?'

'বল—'

'আমিও তো এ-বাড়ির মেয়ে—'

কৃষ্ণকিশোর বলেছেন, 'সেটা কেউ অস্বীকার করছে না।'

সামান্য উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল দীপালি, 'এ-বাড়িতে অন্য সবার মতো আমারও তো একটা ভাগ আছে। তাই—'

একদৃষ্টে অনেকক্ষণ দীপালির দিকে তাকিয়ে ছিলেন কৃষ্ণকিশোর। তারপরে বলেছেন, 'আমি এক্ষুনি মারা যাচ্ছি না। স্পেশালিস্ট ডাক্তাররাও জানিয়েছেন, তোমাদের মায়ের স্বাস্থ্য যেভাবে ইমপ্রুভ করছে, যত্ন করে তাকে রাখলে, অরও কয়েকটা বছর বেঁচে যাবে। তা হলে বুঝতেই পারছ—' বলে হঠাৎ থেমে গিয়ে মেয়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে থাকেন।

বাবার কথাগুলোর ভেতর এমন কিছু আছে যেটা পরিষ্কার ধরতে পারে নি দীপালি। সে ধন্দে পড়ে গিয়েছিল। 'কী বুঝব বাবা?'

কৃষ্ণকিশোর বলেছেন, 'বিষয় সম্পত্তি ভাগাভাগির কথা আমি এখনও চিন্তা

করি নি। কতকাল বাদে একটু সুখের মুখ দেখেছি। আগে কিছুদিন ভোগ টোগ করি। তারপর দেখা যাবে।'

দীপালি নাছোড়বান্দা। কোনও কিছু নিয়ে পড়লে তার শেষ না দেখে সে ছাড়ে না, বিশেষ করে যেখানে তার স্বার্থ জড়িয়ে থাকে। বলেছিল, 'তুমি ভুল বুঝছ বাবা। এক্ষুনি তোমাকে কি কিছু করতে বলছি? তবে—'

'কী?'

'একদিন না-একদিন উইল তো করবে। তখনও কি আমার কথা ভাববে না?'

কৃষ্ণকিশোর মেয়ের দিক থেকে চোখ সরান নি। 'কবে কী করব তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাতে আমি রাজি নই। তা ছাড়া—'

'কী?'

'সেই বিয়ের সময় থেকে আমার কাছ থেকে কম আদায় করে তো নাও নি। তোমার শ্বশুরদের অবস্থা ভাল, শ্যামবাজারে বিশাল বাড়ি, তোমার স্বামী মানে আমাদের জামাই মস্ত চাকরি করে, প্রচুর টাকা মাইনে পায়। এরপর আর কিছু কি দরকার আছে?'

কয়েক সেকেন্ড নিঝুম বসে থেকেছে দীপালি। মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছিল, হতাশার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। তবু হাল একেবারে ছেড়ে দেয় নি। চেষ্টা চালিয়ে গেছে ব্যাকুল ভাবে। বোঝাতে চেয়েছে, শ্বশুরবাড়ির বৈভব যতই থাক, বাপের বাড়ির এক কুচি কিছু পেলেও সেটা মেয়েদের কাছে অত্যন্ত গর্বের জিনিস।

কৃষ্ণকিশোর ধীরে ধীরে মাথা নেড়েছেন, 'সব বুঝলাম। এবার একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

দীপালি বলেছে, 'হ্যাঁ, করো না—'

'এতকাল বাদে 'মহামায়া ধামে'-এ পা ফেলার পর শুধু টাকা পয়সা বিষয় আশয় নিয়েই টানা হ্যাঁচড়া চালিয়ে যাচ্ছ। একবারও কি জানতে চেয়েছ, ছোট ভাইবোনগুলো কী করছে, তোমার মায়ের শরীর-স্বাস্থ্য কেমন আছে?'

দীপালি হকচকিয়ে গেছে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সবার খবর নেব।'

'মা ভাইবোনদের সঙ্গে গল্প টল্প কর। আর যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ সেটা চিন্তা থেকে বার করে দাও।'

দশ

পুজোর আর বেশি দেরি নেই।

দোতলা, তেতলা এবং ছাদ মেরামত হয়ে গেছে। একতলার কিচেন আর খাওয়ার ঘরের কাজও শেষ। তবে পাশের দু'টো ঘর ভেঙে যে হল বানানো হয়েছিল তার মেঝে মোজেক করা, দেওয়ালে প্ল্যাস্টার অফ প্যারিস লাগানো, এয়ার কন্ডিশনার করবার জন্য ফোকর বানানো — কোনও কিছুই বাকি নেই। কিন্তু এর পর কী করা হবে তা এখনও জানান নি কৃষ্ণকিশোর।

এদিকে রাজলক্ষ্মীর যা রোগ তা একেবারে সারবার নয়। তবে স্বাস্থ্যের অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। বাকি জীবন তাঁকে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। ধরাবাঁধা নিয়মে চলতে হবে। স্পেশালিস্টরা বিশেষ একটা পরামর্শ দিয়েছেন। ওষুধ টোষুধ যেমন চলছে তেমনি চলবে। তবে বহুকাল বাড়িতে আটকে আছেন, কিছুদিনের জন্য যদি কোনও স্বাস্থ্যকর জায়গায় কাটিয়ে আসেন, মানসিক দিক থেকে ভাল তো লাগবেই, শরীরও অনেক তাজা হয়ে উঠবে।

কৃষ্ণকিশোর ঠিক করে ফেলেছেন লক্ষ্মীপুজোর পর স্ত্রীকে নিয়ে মাসখানেকের জন্য পুরী চলে যাবেন। রাজলক্ষ্মীর জীবনের একটাই শখ। সেটা হল ভ্রমণ। বিয়ের পর গোয়া আলমোড়া নৈনিতাল খাজুরাহো—এমনি কিছু কিছু জায়গায় তাঁকে নিয়ে যেতে পেরেছেন কৃষ্ণকিশোর। পরের দিকে এতগুলো ছেলেমেয়ে জন্মাল। খরচ বাড়তে লাগল হু হু করে। তারপর জীবনে কত কীই তো ঘটল। অফিসে ক্লোজার। যে উপযুক্ত দুই ছেলে পাশে দাঁড়াতে পারত তারা সরে পড়ল। জমানো যা ছিল, বড় মেয়ের বিয়েতে শেষ হল। সংসারে নিত্য অভাব। হাজারটা সমস্যা। তার ওপর মারাত্মক অসুখে পড়লেন রাজলক্ষ্মী। আনন্দভ্রমণ বন্ধ হয়ে গেল।

বহুকাল পরে সব ক্লেশের অবসান হয়েছে। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আবার স্ত্রীর সাধ মেটাতে চলেছেন কৃষ্ণকিশোর। মা-বাবাকে একা একা ছাড়তে চাইছিল না সুতপারা। অফিসের টাকাটা পাওয়ার পর মনের জোর অনেক বেড়ে গেছে বাবার। কিন্তু এটা তো স্বীকার করতেই হবে, তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। রাজলক্ষ্মী অনেকটা সুস্থ হলেও তাঁকে চোখে চোখে রাখতে হয়, ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়াতে হয়, সেবাযত্নের লেশমাত্র ত্রুটি হবার উপায় নেই। এত সব ধকল কৃষ্ণকিশোরের পক্ষে সামলানো মুশকিল। সুতপারা অনেক বুঝিয়েছে। বলেছে, নমিতা বরং সঙ্গে থাক। তিনি রাজি হননি।

আজ সকালে চান-খাওয়ার পর সুতপা যখন 'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস'-এ বেরুতে যাবে, কৃষ্ণকিশোর তার ঘরে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর কাজের কিরকম প্রেসার চলছে?'

সুতপা অবাক। কোনও দিন বাবা তার কাজকর্ম নিয়ে কিছু জানতে চান না। সে বলল, 'কেন বল তো?'

'দরকার আছে।'

'খুব চাপ।'

'যত চাপই থাক, আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবি। এই ধর পাঁচটার ভেতর।'

রোজ বাড়ি আসতে আসতে সন্ধে পেরিয়ে যায় সুতপার। বেশি কাজ থাকলে আরও দেরি হয়। সে বলল, 'পাঁচটায় বাড়ি আসতে হলে সাড়ে তিনটে, পৌনে চারটেয় বেরোতে হবে। প্রদোষদা কি তখন আমাকে ছাড়বেন?'

কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'তোর প্রদোষদাকে বলবি, বাড়িতে খুব একটা জরুরি কাজ আছে। আমি তোকে চলে আসতে বলেছি।'

'কী কাজ?'

'এখন কিচ্ছু বলব না। ফিরে এলে সব জানতে পারবি।'

'লাহিড়ী'স লেজারগ্রাফিকস'-এ এসে ভাল করে কম্পোজে মন বসাতে পারল না সুতপা। বাবা কেন তাকে পাঁচটায় বাড়িতে হাজির হতে বলেছেন, মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল সে। কম্পোজে ভুল হয়ে যাচ্ছিল।

প্রদোষকে কৃষ্ণকিশোরের কথা বলতে তিনি সাড়ে তিনটেয় ছেড়ে দিলেন।

মির্জাপুর থেকে হেঁটে পাতাল রেলের সেন্ট্রাল স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেন ধরে কালীঘাট স্টেশনে এসে অটোয় করে বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে সোয়া পাঁচটা বেজে গেল।

সদর দরজার কাছে নান্টুর সঙ্গে দেখা। সে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিল। সুতপা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছিস রে?'

ছোটদিকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল নান্টু। বলল, 'নকুল মিষ্টান্ন ভাণ্ডার-এ। বাবা রাজভোগ আর তালশাঁস সন্দেশ আনতে দিয়েছে।' একটু থেমে, ভুরু নাচিয়ে মিটি মিটি হাসতে হাসতে বলতে লাগল, 'একজন অনারেবল গেস্ট এসেছে বাড়িতে। বাবাই তাকে ধরে এনেছে। ভদ্রলোককে মিষ্টি-ফিষ্টি না খাওয়ালে হেভ্‌ভি খারাপ দেখায় কিনা, তাই বাবা একশো টাকার কড়কড়ে একখানা পাত্তি ধরিয়ে বলল, জলদি মিঠাও লাও—'

'গণেশ কেবিন'-এ দু'বছর গুলতানি করে হিন্দি-ইংরেজি মিশিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে নান্টু। সুতপা একেবারেই পছন্দ করে না। অন্য সময় হলে কষে ধমক লাগাত। কিন্তু এখন অতিথি সম্পর্কে কৌতূহল হচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, 'কাকে আবার ধরে আনল বাবা?'

নান্টু বলল, 'যা না, নিজের চোখেই দেখতে পাবি। তেতলায় মা-বাবার বেডরুমে হেভ্‌ভি কনফারেন্স বসে গেছে।' বলে আর দাঁড়াল না। সুতপাকে কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে নরেশ আড্ডি রোডে চটাস চটাস চটির আওয়াজ তুলে চলে গেল।

বাড়ির ভেতর এসে সুতপা শুনতে পেল, জয়নালের লোকেরা কর্কশ আওয়াজ করে একতলার হল-ঘরের মোজেক ঘষছে। মিস্তিরিরা যখন কাজ করে, কৃষ্ণকিশোর সারাক্ষণ তাদের গায়ে জোঁকের মতো লেগে থাকেন। কিন্তু এখন তাঁকে দেখা গেল না।

একতলায় বারান্দার ধার ঘেঁষে সিঁড়ি। সেখানে এসে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে ধাপ ভেঙে ওপরে উঠে এল সুতপা। মা-বাবার ঘরের দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একেবারে থ হয়ে গেছে সে।

ঘরের ভেতর একটা চেয়ারে বসে আছে দীপঙ্কর। খাটে বসেছেন কৃষ্ণকিশোর এবং রাজলক্ষ্মী। মায়ের পাশে বিছানায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নমিতা।

একমুখ হেসে কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ভেতরে আয়—'

কোন মহামান্য অতিথি আপ্যায়নের জন্য নান্টুকে 'নকুল নিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এ পাঠানো হয়েছে, এতক্ষণে স্বচক্ষে দেখা গেল। ঘরে ঢুকে পায়ে পায়ে মা-বাবার খাটের একধারে জড়সড় হয়ে বসে পড়ল সুতপা। চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করল, মা এবং ছোটদির চোখ থেকে কুলকুল করে হাসি যেন উপচে পড়ছে।

কৃষ্ণকিশোর বলতে লাগলেন, 'দীপঙ্করকে ধরে এনে তোকে কেমন চমকে দিয়েছি বল?'

এই কারণেই যে কৃষ্ণকিশোর আজ পাঁচটার ভেতর তাকে বাড়ি ফিরতে বলেছিলেন, ঘুণাক্ষরেও আগে আঁচ করা যায়নি। চমক বলে চমক! আচমকা একেবারে বোবা হয়ে গেছে সুতপা। তার গলা দিয়ে টুঁ শব্দটিও বেরিয়ে এল না।

অফিসের বকেয়া টাকা উদ্ধারের পর একের পর এক ভেলকি দেখিয়ে চলেছেন কৃষ্ণকিশোর। পারিবারিক কোনও ব্যাপারে বাড়ির কাউকে তিনি মুখ খুলতে দিচ্ছেন না। যা বলার একাই বলছেন। তাঁর মধ্যে আলাদা ব্যক্তিত্ব, অন্যরকম একটা এনার্জি এসে গেছে।

কৃষ্ণকিশোর বলতে লাগলেন, 'তুই হয়ত অবাক হয়ে ভাবছিস, দীপঙ্করকে আমি কীভাবে খুঁজে বার করলাম। কি, ঠিক কিনা?'

বাবা যেন তাকে পুরোপুরি জাদু করে ফেলেছেন। নিজের অজান্তে খুব আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় সুতপা।

কৃষ্ণকিশোর এবার যা বললেন তা এইরকম। দীপঙ্কর এর আগে একদিনই মাত্র 'মহামায়া ধাম'-এ এসেছিল। তাকে দেখে সেদিন ধন্দ লেগে গিয়েছিল তাঁর। কোনও অনাত্মীয় যুবক সুতপার কাজের খবর নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত ছুটে এসেছে, সেটা নিঃস্বার্থ পরোপকার না-ও হতে পারে। তখন কাজের ব্যাপারটাই বড় ছিল, অভাব-অনটনে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, তাই এ-নিয়ে তিনি খুব একটা মাথা ঘামাননি। পরে তিন-চার বার পাতাল রেলের কালীঘাট স্টেশনের সামনে সুতপার সঙ্গে দীপঙ্করকে গল্প করতে দেখেন। কলেজের বন্ধুর মাসতুতো দাদা বিনা উদ্দেশ্যে নরেশ আড্ডি রোডে হানা দেয়নি। ব্যাপারটা তাঁর কাছে জলবৎ পরিষ্কার হয়ে যায়। কৃষ্ণকিশোর তক্কে তক্কে থাকেন। তারপর একদিন দীপঙ্করের পিছু নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পণ্ডিতিয়ার ভেতর দিকের গলিতে তাদের বাড়িটা দেখে আসেন।

শুধু তাই নয়, আরেক বার, 'গ্লোব' সিনেমার পাশের গলিতে 'ড্রিমল্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং'-এর অফিস পর্যন্ত গিয়েছিলেন। দীপঙ্কর সম্পর্কে দু'জায়গাতেই খোঁজখবর নিয়েছেন।

শুনতে শুনতে বিস্ময়ে চোখের তারা স্থির হয়ে গিয়েছিল সুতপার। তার সাদাসাপটা, নিরীহ, ভালমানুষ বাবার মাথায় এত সব জটিল ব্যাপার রয়েছে, আগে কখনও টের পাওয়া যায়নি। লোকটাকে যত দেখছে, চমকের মাত্রা ততই বেড়ে যাচ্ছে।

এবার কৃষ্ণকিশোর দীপঙ্করের দিকে তাকিয়ে লঘু সুরে বলেছেন, 'মেয়ে কার সঙ্গে মেলামেশা করছে, সেটা বাপ হয়ে আমার জানা কর্তব্য কি না, তুমিই বল—'

দীপঙ্করের মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে। সে কোনও উত্তর দেয় না।

'নকুল মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' থেকে ফিরে এসেছিল নান্টু। নমিতা দীপঙ্করের জন্য প্লেট ভর্তি করে মিষ্টি আর সবার জন্য চা করে এনে দিল।

চায়ে চুমুক দিয়ে কৃষ্ণকিশোর সুতপাকে বললেন 'কাল রাত্তিরে আমি দীপঙ্করদের বাড়ি গিয়ে ওদের সবার সঙ্গে ভাল করে আলাপ-পরিচয় করেছি। আজ পাঁচটায় ওকে আমাদের বাড়িতে আসতে বলেছি। ওকে দিয়ে কড়ার করিয়ে নিয়েছি, এই খবরটা যেন আগেভাগে তোকে না দিয়ে বসে।'

সুতপা এবার হেসে ফেলে, 'বাবা, তুমি পারোও বটে—'

মেয়ের কথা যেন শুনতেই পাননি, এমন ভাব করে কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'যে-

জন্যে বিশেষ করে দীপঙ্করকে আসতে বলেছি সেটা সবাই শোন। ছোট খুকি আর দীপঙ্কর যে কাজ করে, তাতে কোনও সিকিউরিটি নেই। চাকরির বাজার ভীষণ খারাপ। পার্মানেন্ট কোনও কাজ ওরা জোটাতে পারবে কিনা, সন্দেহ। তারপর নান্টু আছে। ওরও এক প্রবলেম।' একটু থেমে, দম নিয়ে বলতে লাগলেন, 'আজকাল তো কম্পিউটারের রমরমা। তাই ঠিক করেছি, আমাদের বাড়ির একতলায় ক'টা ডিটিপি মেশিন বসিয়ে দেব। এ-ব্যাপারে সব তো জানি না। আর যা যা করলে ভাল বিজনেস হয় সুতপা আর দীপঙ্কর তা ঠিক করবে। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে নান্টু ট্রেনিং নেবে। মেজ খুকি হায়ার সেকেন্ডারি পাশ। শুধু শুধু বসে থাকবে কেন? ও-ও কম্পিউটার শিখবে। প্রথমে খুব বড় আকারে নয়, যেটুকু না করলে চলবে না, ততটুকুই করা হবে। পরে বিজনেস বাড়লে বেশি টাকা ঢালা যাবে। অন্যের দরজায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে নিজেরাই কিছু একটা গড়ে তোল সকলে মিলে।'

একতলায় হল-ঘর বানানো, এয়ার-কন্ডিশনার বসাবার ব্যবস্থা করা—এসবের কারণ এতদিনে বোঝা গেল। কৃষ্ণকিশোর সত্যিই দূরদর্শী। ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতে যাতে দাঁড়াতে পারে, তার নিখুঁত পরিকল্পনা আগেই করে রেখেছেন।

দীপঙ্করকে দেখার পর থেকে নিজেকে অনেকখানি গুটিয়ে রেখেছিল সুতপা। এখন তার মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ খেলে যায়। দারুণ উৎসাহের সুরে বলে, 'ডিটিপি তো থাকবেই। এখানে একটা কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারও খুলে ফেলব। ছ'মাসে এটা দাঁড়িয়ে যাবে।' দীপঙ্করের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কি, দাঁড় করানো যাবে না?'

দীপঙ্কর একটু হেসে মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর কৃষ্ণকিশোর দীপঙ্করের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এবার আরেকটা ভেরি ইমপর্টান্ট কাজের কথা হয়ে যাক। তোমরা পণ্ডিতিয়ার গলির ওই ছোট বাড়িটা ছেড়ে বেশি ঘরওলা একটা ফ্ল্যাট নাও। তুমিও দেখতে থাক। আমিও চেতলায় খোঁজ করি।'

দীপঙ্কর হতভম্ব। মিনমিনে গলায় বলল, বাড়ি বদলাতে বলছেন কেন?'

'বিয়ের পর ছোট খুকিকে কোথায় নিয়ে তুলবে? তোমাদের ওই ছোট বাড়িতে তেমন জায়গা আছে?'

মুখটা মলিন হয়ে গেল দীপঙ্করের, 'আপনি তো সবই জানেন। ভাল, বড় বাড়ি নেবার ক্ষমতা আমার নেই।'

কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'টাকার জন্যে তুমি ভেবো না। ওটা আমি দেখব।'

কুণ্ঠিতভাবে দীপঙ্কর বলল, 'না না, তা হয় না।'

'আরে বাবা, ছোট খুকির বিয়েতে কিছু যৌতুক তো দিতে হবে। ধর ওটা তা-ই।

নগদ টাকা নিতে যদি সঙ্কোচ হয়, লোন হিসেবে নিও। পরে রোজগার বাড়লে অল্প অল্প করে শোধ কোরো।'

এরপরও আপত্তি করতে যাচ্ছিল দীপঙ্কর। প্রবল দাপটে তাকে থামিয়ে দিলেন কৃষ্ণকিশোর।

এগারো

পুজো কেটে গেল। এর মধ্যে সুতপা আর দীপঙ্কর হল-ঘরটায় ছোট ছোট খোপ করিয়ে, চেয়ার-টেবল বসিয়ে মোটামুটি সাজিয়ে ফেলেছে। কম্পিউটার মেশিন এবং এয়ার-কন্ডিশনারেরও অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। সেগুলো বসাতে আরও দু'তিন সপ্তাহ লেগে যাবে।

দুর্গাপুজোর পর লক্ষ্মীপুজোও প্রায় এসে গেল। কৃষ্ণকিশোর ঠিক করে রেখেছেন, লক্ষ্মীপুজোর সপ্তাখানেক পর স্ত্রীকে নিয়ে পুরী বেড়াতে যাবেন। টিকেট কাটা, হোটেলের বুকিং—সব হয়ে গেছে। তাঁর পুরী থেকে ফিরে এলে বেশ ঘটা করে, লোকজন নেমন্তন্ন করে একতলার কম্পিউটার সেন্টারটা খোলা হবে।

লক্ষ্মীপুজোর পরদিন সন্ধেবেলা সুতপা নান্টু এবং নমিতাকে তেতলায় নিজের বেডরুমে ডেকে নিয়ে এলেন কৃষ্ণকিশোর। রাজলক্ষ্মী ঘর থেকে প্রায় বেরোনই না, তিনি বিছানায় বসে ছিলেন।

ছেলেমেয়েদের বসিয়ে নিজে একটা চেয়ার টেনে মধ্যমণি হয়ে বসলেন কৃষ্ণকিশোর। বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে খুব জরুরি একটা কথা আছে।'

অফিসের টাকাটা হাতে আসার পর থেকে কৃষ্ণকিশোরের কার্যধারার তল-কূল পাওয়া যাচ্ছে না। একেক দিন একেক রকম চমক দিয়ে চলেছেন তিনি। সবাই তাঁর দিকে উদ্‌গ্রীব তাকিয়ে থাকে।

কৃষ্ণকিশোর বলতে লাগলেন, 'যতই গুমর করে বলি এখনও অনেকদিন বাঁচব কিন্তু এটা তো ঠিক, বয়েসটা সত্তর ছুঁতে চলল। ইন্ডিয়ানদের অ্যাভারেজ আয়ু কত? যদি পঁয়ষট্টি হয়, আমি সেটা পেরিয়ে এসেছি। আর কে না জানে জন্ম মৃত্যু বিয়ে, কোনওটাই মানুষের হাতে নেই। জীবন পদ্মপত্রে জলবিন্দু। এই আছে, এই টুপ করে ঝরে পড়ল।'

ছেলেমেয়েরা এবং স্ত্রী কোনও উত্তর দেয় না।

কৃষ্ণকিশোর থামেননি, 'তাই ঠিক করেছি, উইল করব। কাল ল-ইয়ারের সঙ্গে দেখা করে কাকে কী দেব, সব বলে এসেছি। উনি ড্রাফটটা তৈরি করে রাখবেন। আমি ফিরে আসার পর রেজিস্ট্রি করব। অবশ্য তার আগে বয়ানটা তোমাদের শোনাব।'

সুতপারা কেউ কিছু বলল না। শুধু রাজলক্ষ্মী রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে কী দেবে?'

কৃষ্ণকিশোর রহস্যময় হেসে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'এখন কিচ্ছু বলব না। যখন ড্রাফটটা পড়া হবে তখন সব জানতে পারবে। ক'টা দিন ধৈর্য ধরে থাকো।'

অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন রাজলক্ষ্মী কিন্তু কৃষ্ণকিশোরের মুখ থেকে আর একটি শব্দও বার করতে পারলেন না।

*　　　*　　　*

স্ত্রীকে নিয়ে আজ পুরী রওনা হলেন কৃষ্ণকিশোর। সুতপা নমিতা দীপঙ্কর আর নান্টু হাওড়ায় এসে তাঁদের ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল।

ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেন্টের পুরু গদিওলা সিটে কাত হয়ে শুয়ে এই আনন্দভ্রমণ স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল রাজলক্ষ্মীর। কত কাল পর যে বেড়াতে বেরোলেন! তাও এত আরামে, এমন হাত-পা ছড়িয়ে! কিন্তু মাথার ভেতর একটা দুর্ভাবনা ক'দিন ধরেই কাঁটার মতো বিঁধে আছে।

কৃষ্ণকিশোর বিপুল উদ্দীপনায় একটানা বকবক করে চলেছেন। তাঁর মাথায় হাজারটা পরিকল্পনা। পুরী গিয়ে রোজ সমুদ্রতীরে প্রাতঃভ্রমণ, জগন্নাথদেবের মন্দিরে পুজো, কোনারক, তোশালি বিচে ঘুরে আসা, ভুবনেশ্বরে গিয়ে চারপাশের প্রাচীন তীর্থস্থান এবং নন্দনকানন দেখা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কথাগুলো দুর্বোধ্য ভনভনানির মতো কানের কাছে বেজে চলেছে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছেন না রাজলক্ষ্মী। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

কৃষ্ণকিশোর থমকে গেলেন। একদৃষ্টে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী?'

'মন্টু, সন্তু, বড় খুকিকে তুমি কি কিছুই দেবে না?'

কৃষ্ণকিশোর চমকে ওঠেন, 'উইল করার কথা যেদিন বলি সেদিন থেকেই লক্ষ করেছি তুমি ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে থাকো। নিশ্চয়ই মন্টু-সন্তুদের কথা সারাক্ষণ ভাবো?'

রাজলক্ষ্মী চুপ করে রইলেন।

কৃষ্ণকিশোর স্ত্রীর একখানা কৃশ হাত তুলে নিয়ে কোমল স্বরে বললেন, 'যত অন্যায় করুক, ওরাও আমাদের সন্তান। লোকে ওদের অপমান করবে, কোর্টে টেনে নিয়ে যাবে, তাই কি হতে দিতে পারি? এ-কথা ওদের আগে থেকে জানিও না। কৃতকর্মের জন্যে কিছুদিন তিনজন কষ্ট পাক।' একটু থেমে বললেন, 'চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আবেগে গলার কাছটা কাঁপতে থাকে রাজলক্ষ্মীর। দু'চোখ বাষ্পে ভরে যায়।

ভারতবর্ষ

ক'দিন ধরেই বম্বের এই এলাকাটা থমথমে হয়ে আছে। চারদিক একেবারে নিঝুম।

সামনের যে খাড়িটা আরবসাগরে গিয়ে পড়েছে তার ওপর দিয়ে ছ-লেনের হাইওয়ে। খাড়ি থাকায় দেড় কিলোমিটার লম্বা দৈত্যাকার একটা ফ্লাইওভারও বানাতে হয়েছে। কাছে-দূরে অগুনতি হাই-রাইজ আকাশ ফুঁড়ে মাথা তুলে আছে। পেছন দিকে চাপ-বাঁধা বিশাল বস্তি। অ্যাসবেস্টস, পলিথিনের শিট, পেটানো টিন, টালি, বাঁশ, তেরপল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি মানুষের কুৎসিত, ভঙ্গুর উপনিবেশ। বাসিন্দাদের সবাই খেটে খাওয়া দিনমজুর। গরিবের চাইতেও গরিব। বম্বে হচ্ছে সিটি অফ গোল্ড। কাজ এবং খাদ্যের খোঁজে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের মানুষ ওই বস্তিটায় এসে মাথা গুঁজে আছে। বেশির ভাগই মুসলমান।

বস্তিটা থেকে অনেকটা দূরে সুমিত্রা তলোয়ারকরদের তিনতলা বাড়ি। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসগুলোর মাঝখানে সেটা মাথায় এমনই খাটো যে প্রায় নজরেই পড়ে না। তবে বাড়িটা ঘিরে ফাঁকা জায়গা আছে অনেকখানি। প্রমোটাররা বেশ কয়েকবার ওটা ভেঙে বিরাট একটা হাই-রাইজ তোলার জন্য হানা দিয়েছিল। দিতে চেয়েছে অঢেল টাকা এবং দেড় হাজার স্কোয়ার ফিটের তিনটে ফ্ল্যাট। সুমিত্রা, বিশেষ করে তাঁর স্বামী দিবাকর তলোয়ারকর রাজি হননি। মানুষটা অন্য ধাতের। বিপুল প্রলোভনও তাঁকে টলাতে পারেনি।

বাড়িটা যাট বছর আগে দিবাকরের ঠাকুরদা তৈরি করিয়েছিলেন। ভারতীয় স্বাধীনতার চাইতে এটার বয়স তের বছরেরও বেশি। বম্বে মেট্রোপলিস যখন চোখধাঁধানো স্থাপত্যে ছেয়ে গেছে সেখানে এই বাড়িটার চেহারায় না আছে জলুস, না কোনও চমক। কিন্তু যে বাসস্থানে ঠাকুরদা, বাবা, তিনি এবং তাঁর মেয়ে, অর্থাৎ চার প্রজন্মের দুঃখ, স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের হাজার স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেটা ধ্বংস হয়ে হাই-রাইজ উঠবে, পায়রার খোপের মতো ঘরের ওপর ঘর তুলে তৈরি করা হবে দমবন্ধ-করা একটা পরিবেশ, প্রতিবেশী হিসেবে আসবে অসম থেকে কেরল পর্যন্ত নানা অঞ্চলের মানুষ, সারাক্ষণ হইচই উত্তেজনা অশান্তি আর চড়া সুরে নানা ভাষায় চিৎকার চেঁচামেচির অর্কেস্ট্রা, নিজস্বতা বলতে প্রায় কিছুই থাকবে না তুলোয়ারকরদের—এসব মোটেও মেনে নিতে পারেননি দিবাকর। বংশ নিয়ে তাঁর বিরাট গর্ব। বম্বে সিটিতে মানুয যেখানে উন্মাদের মতো টাকার পেছনে দৌড়চ্ছে সেখানে এক ফোঁটা ঘাম না ঝরিয়ে তিনি দু-তিন কোটি টাকার মালিক হতে পারতেন। কিন্তু বাড়িটা প্রমোটারদের হাতে তুলে দিলে তাঁদের পারিবারিক ইতিহাসের অনেকটাই লুপ্ত হয়ে যেত। এটা তিনি চাননি।

সন্ধে নেমে গেছে কিছুক্ষণ আগে।

তেতলায় প্রকাণ্ড শোবার ঘরে, জানালার ধার ঘেঁষে বসেছিলেন সুমিত্রা। ত্রস্ত, উৎকণ্ঠিত। বাড়িতে তিনি ছাড়া আপাতত আর কেউ নেই। রান্নার একটা লোক তাঁদের আছে। মারাঠি ব্রাহ্মণ। নাম ধুমল। সে থাকে অনেকটা দূরে। সেই ভারসোবায়। বিকেলে রাতের খাবার তৈরি করে দিয়ে সে চলে গেছে। আসবে কাল সকালে, ন'টা নাগাদ। যদি বাস কি ট্রেন ঠিকঠাক চলে।

আরও দু'জন কাজের লোক ছিল সুমিত্রাদের। একটি ঘাটি (পাহাড়ি) মেয়েমানুষ। অন্যটি পুরুষ। মাঝবয়সী কোশি। তারা যেখানে থাকে, ক'দিন ধরে সেই সব অঞ্চলে ভীষণ গোলমাল চলছে। ওদিকের গাড়িঘোড়া বন্ধ। ওরা আসবেই কী করে? একমাত্র ভরসা ধুমল, সে-ই বা ক'দিন আসতে পারবে, কে জানে।

সুমিত্রা এ-বছর তিপান্ন পেরিয়েছেন। রং টকটকে ফর্সা না হলেও এই বয়সেও যথেষ্ট সুন্দরী। ক'দিন আগেও ছিলেন যথেষ্ট হাসিখুশি, প্রাণবন্ত। প্রচুর হইহই করতে পারতেন। সারাক্ষণ যেন টগবগ করে ফুটছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি এক পাথরপ্রতিমা। সারা মুখে কালির পুরু ছোপ। লহমায় স্বাস্থ্য ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। কেউ বুঝিবা তাঁর বেঁচে থাকার সবটুকু আনন্দ আর ইচ্ছা শুষে নিয়ে একটা শুকনো খোলস ফেলে রেখে গেছে।

ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড খাটের ওপর দিবাকরের ফোটো। ফোটোর ফ্রেমটা এত চকচকে, বোঝা যায়, মাত্র কয়েকদিন আগে সেটা বাঁধানো হয়েছে। ফোটোটা ঘিরে জুঁই ফুলের মোটা মালা। ধুমলকে টাকা দেওয়া আছে। রোজ কাজে আসার সময় সে একটা করে মালা কিনে আনে।

ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে ওয়ার্ডরোব। ডিভান। ক'টা সোফা। ড্রেসিং টেবল। টেলিফোন। রঙিন টিভি। মেঝেতে দামি কার্পেট। আর এয়ার-কুলারও আছে।

গত মাসে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল। তার প্রতিক্রিয়ায় পর পর ব্লাস্ট ঘটানো হয়েছে বম্বেতে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল দাঙ্গা। হত্যা। আগুন। অবাধ লুটতরাজ। সেই দাঙ্গা এখনও চলছে। ভয়াবহ আকারে। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে নতুন নতুন এলাকায়। মহানগর এখন জ্বলছে।

সুমিত্রার স্বামী দিবাকর তলোয়ারকর ছিলেন একটা ন্যাশনালাইজড ব্যাঙ্কের বিরাট অফিসার। বম্বে ব্লাস্টের সময় স্টক এক্সচেঞ্জের কাছে কী কারণে গিয়েছিলেন। বিস্ফোরণে তাঁর শরীর শত টুকরো হয়ে যায়। পোখরাজের আংটি, দাঁতের পাটি, ডান পায়ের পাতা এবং আঙুল দেখে তাঁকে শনাক্ত করা গেছে। কিছুদিন আগে তাঁর পারলৌকিক কাজকর্ম চুকেছে।

ফোটোটা দেখে অনুমান করা যায়, দিবাকর ছিলেন সুপুরুষ, গম্ভীর ধরনের মানুষ।

সুমিত্রাদের একমাত্র মেয়ে মাধুরী থাকে কানাডায়। তার স্বামী টোরোন্টো ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। সেখানকার ন্যাশনালিটি পেয়েও গেছে। টোরোন্টোয় বাড়িও করেছে। বাবার মৃত্যুর সময় সে বম্বে আসতে পারেনি। তখন সে মেটার্নিটি হোমে। সন্তান জন্মের পর আসতে চেয়েছিল। তার ইচ্ছা, বাবাই যখন নেই, সুমিত্রার একা একা বম্বেতে পড়ে থাকার মানে হয় না। জীবন সম্পর্কে মাধুরীদের ধ্যানধারণা অন্যরকম। পৃথিবী আগের জায়গায় আর অনড় দাঁড়িয়ে নেই। সমস্ত কিছু তড়িৎ গতিতে পালটে যাচ্ছে। আজকের মানুষের কাছে বম্বেও যা, টেরোন্টো মেলবোর্ন টোকিও বা লন্ডনও তাই। পারিবারিক গৌরবের আবেগ-টাবেগ নেহাতই জলো সেন্টিমেন্ট মাত্র। মাধুরী চায়, বম্বের বাড়ি বিক্রি করে ইন্ডিয়ার সঙ্গে চিরতরে সম্পর্ক চুকিয়ে মাকে নিজের কাছে নিয়ে যায়।

মেয়ের কথাগুলো যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ। এই মুহূর্তে বম্বে যখন হননকারীদের দখলে চলে গেছে, মানুষ আর মানুষ নেই, হিংস্র আদিম জন্তুর মতো দঙ্গল বেঁধে শিকারের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে তখন মাধুরীদের না আসাই ভাল। সুমিত্রা বারণও করেছেন। বম্বে বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। শহর স্বাভাবিক হোক, মানুষের মাথায় যে খুন চেপেছে সেটা কাটুক, তারপর যেন মাধুরীরা আসে। সবাই মিলে ঠাণ্ডা মাথায় আলোচনা করে তখন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

প্রতিদিনই, দিনে বা রাতে, অন্তত একবার মাধুরী মাকে ফোন করে খোঁজ নেয়। মারাত্মক উদ্বেগে তার দিন কাটছে। সুমিত্রা মেয়েকে বোঝান, তাঁদের এলাকাটা নিরাপদ। দুর্ভাবনার কারণ নেই। তিনি ভালই আছেন।

নাগপুরে সুমিত্রার বাপের বাড়ি। দিবাকর মা-বাবার একমাত্র সন্তান। চিরকালই ওঁরা বম্বের বাসিন্দা। দিবাকরের মাসিরা আছেন কোলাপুরে। নাগপুর থেকে সুমিত্রার মা-বাবা-দাদারা, কোলাপুর থেকে দিবাকরের মাসিরা, কেউ না কেউ, রোজ ফোনে কথা বলেন। ওঁরাও চান, যতদিন না বম্বের তাণ্ডব বন্ধ হচ্ছে, সুমিত্রা নাগপুর বা কোলাপুরে গিয়ে থাকেন। মেয়েকে যা উত্তর দেন, তাঁদেরও সেই একই কথা বলেন সুমিত্রা। চিন্তার কারণ নেই। তেমন বুঝলে তিনিই ওঁদের জানাবেন। হুট করে কেউ যেন এখন বম্বে চলে না আসেন।

তলোয়ারকররা এই এলাকার বহু পুরনো বাসিন্দা। সবাই তাঁদের সম্ভ্রমের চোখে দেখে। আশপাশের হাই-রাইজের বাসিন্দা যাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাঁদের কেউ কেউ ফোনে খোঁজখবর নেন। কোনও অসুবিধা হলে ওঁদের কাছে গিয়েও থাকতে পারেন সুমিত্রা। তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এখনও কোনও রকম অসুবিধা বোধ করছেন না।

জানালার বাইরে, দূরে ফ্লাইওভারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন সুমিত্রা। কর্পোরেশনের জোরালো ভেপার ল্যাম্পগুলো এর মধ্যে জ্বলে উঠেছে। চারধারের

বাড়িগুলোতেও অজস্র আলো। বহুদূরের স্কাইস্ক্রেপারগুলোর মাথায় নিওন আলোর বর্ণচ্ছটা। চোখ ঝলসানো অজস্র রঙিন বিজ্ঞাপন। কিন্তু যাদের জন্য এত আয়োজন তাদের কাউকেই প্রায় দেখা যাচ্ছে না।

কথায় আছে, এই শহর এক মুহূর্ত থেমে থাকে না। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেই। ছুটেই চলেছে। সদাব্যস্ত। সর্বক্ষণ কোলাহলময়। কিন্তু আজ সব শুনশান।

অন্যদিন ওই ফ্লাইওভারটার ওপর দিয়ে গাড়ির স্রোত বয়ে যায়। মানুষ গিজগিজ করতে থাকে। আজ ক্বচিৎ দু-একটা গাড়ি, চুপিসারে, ভয়ে ভয়ে বুকে হেঁটে নিমেষে উধাও হয়ে যাচ্ছে। লোকজনও প্রায় দেখাই যায় না।

ফ্লাইওভারের ওধারে আরবসাগরে এই সময়টা ট্রলারের মেলা লেগে থাকে। সারাদিন সমুদ্রে মাছ ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে এখন তাদের ফেরার পালা। আজ একটা ট্রলারেরও দেখা নেই। আজ কি মাছের সন্ধানে জেলেরা কেউ বেরোয়নি ?

এতকাল ফ্লাইওভার আর স্কাইস্ক্রেপারের আলো, বিজ্ঞাপনের রঙিন আলোর ঝলকানি সমুদ্রের অনেকটা অংশ পূর্ণ মাত্রায় ভরিয়ে রাখে। দাঙ্গা লাগার পর থেকে আলোও আছে, নিয়নও আছে। কিন্তু সমুদ্রের যেটুকু দেখা যাচ্ছে, সব কেমন যেন ভূতে পাওয়া। অপ্রাকৃত।

সুমিত্রাদের এই এলাকায় এখনও কিছু ঘটেনি। কিন্তু বাতাসে আতঙ্ক ভেসে বেড়াচ্ছে। দাঙ্গা লাগার পর থেকেই তিনি দেখছেন, দিনের বেলা তবু কিছু লোকজন নানা দরকারে বাইরে বেরোয়, কিন্তু সন্ধে নামার পর থেকে চতুর্দিক নির্জন হতে থাকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সবাই বাড়ি ফিরে যায়।

চোখের সামনে পরিচিত সব দৃশ্য। খাড়ি, স্কাইস্ক্রেপার, হাইওয়ে, ফ্লাইওভার, সমুদ্র। সুমিত্রা তাকিয়ে আছেন ঠিকই, কিন্তু কেমন যেন আত্মমগ্ন। কুড়ি বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। দিবাকরের সঙ্গে তেত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনের টুকরো টুকরো শত সহস্র ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। সব যেন পূর্বজন্মের স্মৃতি। তিনি টের পাননি, চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় অবিরল জল ঝরে যাচ্ছে।

সহসা সমস্ত এলাকার নৈঃশব্দ্য খান খান করে চিৎকার ভেসে আসতে লাগল। একটানা। ছেদহীন। বহু মানুষ একসঙ্গে ক্রামাগত হুঙ্কার দিলে যেমনটা শোনায়, সেইরকম।

সচকিত, ত্রস্ত সুমিত্রা এধারে-ওধারে তাকাতে লাগলেন। ভয়ঙ্কর শব্দের উৎসটা কোথায়, বুঝতে চেষ্টা করছেন। লহমায় চোখে পড়ল, হাইওয়ে থেকে যে রাস্তাটা নেমে এসে তাঁদের বাড়ির তিন-চার শো ফিট দূর দিয়ে ডাইনে ঘুরে পেছন দিকে চলে গেছে, সেটা ধরে এক উন্মত্ত জনতা ছুটে চলেছে। তাদের সবাই হাতেই নানা ধরনের মারণাস্ত্র। লোহার ডান্ডা, বর্শা, খোলা তলোয়ার, বিরাট আকারের বাঁকানো দা। এবং বন্দুকও। কারও কারও হাতে পেট্রোলের টিন। বেশিরভাগেরই পরনে

হাফ প্যান্ট, শার্ট বা গেঞ্জি। নিরেট, হিংস্র সব চেহারা। মাটি ফুঁড়েই যেন হঠাৎ এই ঘাতকবাহিনী বেরিয়ে এসেছে।

মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল সুমিত্রার। পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত অসহ্য কাঁপুনি। বুকের ভেতর হাজারটা দামামায় ঘা পড়ছে অবিরল। সিঁটিয়ে যাচ্ছে সারা শরীর।

হননকারীরা রাস্তার আরেকটা মোড় ঘুরে ডাইনে চলে গেল। ওপাশটা সুমিত্রাদের বাড়ির পেছন দিক। তিনি যেখানে বসে আছেন, সেখান থেকে এখন আর ওদের দেখা যাচ্ছে না। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার, কিন্তু এই অঞ্চলে কোথায় হানা দেবে ওরা? কাদের রক্তস্রোত বইয়ে যাওয়ার জন্য দলবদ্ধ হয়ে ওরা ছুটে যাচ্ছে? জ্বালিয়ে ছারখার করে দেবে কাদের ঘববাড়ি? সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।

হানাদারগুলোকে দেখা না গেলেও তাদের উন্মত্ত চিৎকার এখনও শোনা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ একই ভাবে বসে রইলেন সুমিত্রা। অনড়। নিস্পন্দ। হঠাৎ খেয়াল হল, বাড়ির পেছনের অংশে তাঁদের আরও ঘর আছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে জানালা দিয়ে এই সশস্ত্র বাহিনীটাকে দেখা যেতে পারে। ওরা কোন দিকে চলেছে, তা-ও।

পরক্ষণে সুমিত্রার মনে হল, এ নিয়ে কেন এত ভাবছেন? কী প্রয়োজন তাঁর? বিস্ফোরণে দিবাকরের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তাঁর পৃথিবী শতখান হয়ে গেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথায় কী ঘটছে তা নিয়ে কেন তিনি মাথা ঘামাবেন? হত্যাকারীর দলটা যা করতে যাচ্ছে তা-ই করুক।

কিন্তু ক্রমশ কেউ ভেতর থেকে সুমিত্রার কণ্ঠনালি সজোরে টিপে ধরতে শুরু করেছে। মাথায় হাজারটা শেল বিঁধছে। আরবসাগরের পারের এই শহরে যেন এতটুকু বাতাস নেই; লহমায় উধাও হয়ে গেছে। শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে আসতে লাগল সুমিত্রার। অস্থিরতা, ত্রাস, আতঙ্ক— সব মিলিয়ে কী যে এক অনুভূতি! তীব্র। অসহনীয়।

আর বসে থাকা গেল না। নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়ালেন সুমিত্রা। কেউ ধাক্কা মারতে মারতে পেছন দিকের একটা ঘরে তাঁকে নিয়ে গেল। জানালা খোলা ছিল। দু'হাতে গ্রিল ধরে তিনি বাইরে তাকালেন।

হানাদারেরা এর মধ্যে অনেকটা দূরে, সেই বস্তিটার কাছে চলে গেছে। এতক্ষণে ওদের লক্ষ্যটা বোঝা গেল। এবং গন্তব্যও।

একনাগাড়ে হুঙ্কার চলছিলই। দূরত্বটা বেশি বলেই এখন সেটা ক্ষীণ শোনাচ্ছে।

পলক পড়তে না পড়তে হননকারীদের গণ্ডা গণ্ডা মশাল আছড়ে পড়ল বস্তিটার মাথায়। খুব সম্ভব, তার আগে চারপাশ থেকে পেট্রোল ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। পলিথিন, তেরপল, প্যাকিং বাক্সর পাতলা কাঠ, এই সব ঠুনকো দাহ্য জিনিস দিয়ে তৈরি মানুষের পলকা ঘরবাড়ি মুহূর্তে জ্বলে ওঠে। আগুনের শিখা

হাজারটা লকলকে জিভ বার করে ছড়িয়ে পড়ছে দিগ্বিদিকে। ওধারের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে।

বিশাল বস্তিটা ঘিরে আগুনের বেড়াজাল। প্রাণ বাঁচাতে নানা বয়সের মানুষ— বুড়োবুড়ি যুবকযুবতী বউ বাচ্চাকাচ্চা— ভয়ার্ত ইঁদুরের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে। ছুটছে উদ্‌ভ্রান্তের মতো। রুদ্ধশ্বাসে। ঘাতকেরা তাদের তাড়া করে চলেছে। ওখানকার সমস্ত এলাকাটা জুড়ে কাতর আর্তনাদ, জল্লাদদের উল্লাস, আগুন, বন্দুকের আওয়াজ। কয়েক লহমায় জায়গাটা বধ্যভূমি হয়ে উঠেছে।

এমনিতে রাত্রিবেলায় এতদূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়ার কথা নয়। অনেকটা জায়গা জুড়ে গনগনে জোরালো আগুন থাকায় সুমিত্রার সব কিছু নজরে পড়ছিল। যারা পালাতে চাইছে হানাদারদের লোহার ডান্ডা পড়ছে তাদের মাথায়। কারও পেটে আমূল ঢুকে যাচ্ছে ধারাল ছোরা বা বর্শার ফলা। কারও ঘাড়ে পড়ছে তলোয়ারের কোপ। ফোয়ারার মতো বেরিয়ে আসছে রক্ত। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে কত যে রক্তাক্ত মানুষ। মৃত। নিস্পন্দ।

রোজই কাগজে রায়টের অনুপুঙ্খ বিবরণ পড়ছেন সুমিত্রা। জ্বালিয়ে দেওয়া বাড়িঘর, সারি সারি মৃতদেহের ছবিও দেখছেন। কিন্তু সে-সব প্রেস ফোটোগ্রাফারদের ক্যামেরায় তোলা ফোটো।

কিছুদিন আগে ব্লাস্টের ছবিও বেরিয়েছে কাগজগুলোতে। সেই সব বিস্ফোরণের কোনও একটায় দিবাকর মারা গেছেন। কয়েক শো মানুষের বিকৃত ধড় বা মুণ্ডহীন, হাত-পা বিচ্ছিন্ন শবের ছবিও ছাপা হয়েছে। সেগুলো শুধুই ফোটো। জড়। নিষ্প্রাণ। যদিও ভয়ঙ্কর।

কিন্তু দূরের ওই বস্তিটা ঘিরে এখন যা চলছে, এমন বীভৎস দৃশ্য আগে কখনও দেখেননি সুমিত্রা। পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠছে। কেউ যেন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সমস্ত শিরাস্নায়ু ছিঁড়ে ফেলছে। দুই চোখ আতঙ্কে ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। চোখের সামনে জীবন্ত দুঃস্বপ্ন। চতুর্দিকের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন দুলছে। সুমিত্রা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। টলতে টলতে জানালার কাছ থেকে সরে আসতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দৃশ্যটা চোখে পড়ল।

তাঁদের বাড়ির ঠিক পেছন দিকে খাড়ির একটা সরু ফ্যাকড়া বেরিয়ে এসেছে। জল বেশি নেই। বড়জোর কোমর সমান। সেটার গা ঘেঁষে উঁচু উঁচু ক'টা নারকেল গাছ আর প্রচুর ম্যানগ্রোভের জঙ্গল। তারপর প্রায় নিষ্ফলা একটা কাঁকুরে টিলায় সামান্য কিছু মরকুটে চেহারার আগাছা, নাম না জানা রুগ্‌ণ চেহারার দু-চারটে গাছ। টিলা পেরিয়ে বেশ খানিকটা গেলে সেই বস্তিটা।

সুমিত্রা দেখতে পেলেন, টিলার ওপর দিয়ে একটা মাঝবয়সী লোক একটি

তরুণীকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে আসছে। ভীত, আতঙ্কতাড়িত। বোঝা যায়, দূরের ওই দ্বলন্ত বস্তিটা থেকেই ওরা পালাচ্ছে।

মেয়েটা, মনে হল, আর দৌড়তে পারছে না। তার সমস্ত শক্তি এবং উদ্যম প্রায় নিঃশেষ। এলোমেলো পা পড়ছিল তার। মাঝবয়সীটি টেনে হিঁচড়ে না আনলে অনেক আগেই সে মুখ থুবড়ে পড়ে যেত। নিজেকে এবং তার সঙ্গিনীকে বাঁচাবার জন্য প্রৌঢ়টি মরিয়া হয়ে উঠেছে।

ওরা যখন টিলার ঢাল বেয়ে ম্যানগ্রোভের জঙ্গালে প্রায় ঢুকে পড়েছে সেই সময় দেখা গেল ওদিক থেকে টিলার মাথায় উঠে এসেছে আট দশ জনের একটা দল। সশস্ত্র। ভয়ঙ্কর।

আততায়ীর দঙ্গালটা এধারে-ওধারে তাকাচ্ছে। সুমিত্রা অনুমান করে নিলেন, ওরা কাদের খুঁজছে।

মাঝবয়সী লোকটা পেছন ফিরে একবার টিলার মাথার সেই লোকগুলোকে দেখে নেয়। তারপর মেয়েটিকে বুকের মধ্যে আরও গুটিয়ে নিয়ে ম্যানগ্রোভের ডালপালার ভেতর ঘাড় মুখ গুঁজে লুকিয়ে থাকে।

হননকারীরা হাল ছাড়েনি। চারদিক লক্ষ করতে করতে তারা টিলার ঢাল বেয়ে নামতে থাকে। তাদের হয়ত মনে হয়েছে, আধবুড়ো আর যুবতীটি এধারেই কোথাও আছে। আঁতিপাতি করে না খুঁজে তারা যাবে না। কিছুতেই শিকারকে হাতছাড়া হতে দেবে না।

সুমিত্রার হৃৎস্পন্দন থমকে যায়। সমস্ত সৌরলোক যেন দ্রুত অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। হত্যাকারীর দলটা একবার যদি আধবুড়ো এবং তার সঙ্গিনীকে খুঁজে বার করতে পারে, মুহূর্তে তারা রক্তাক্ত লাশে পরিণত হবে। সুমিত্রা আর ভাবতে পারছিলেন না। মাথার ভেতরটা পুরোপুরি ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। জানালার পাশ থেকে যে চলে আসবেন, তাও পারছেন না। কেউ যেন পা দুটো পেরেক ঠুকে ঘরের মেঝেতে আটকে দিয়েছে।

সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার হল, ম্যানগ্রোভের পাতাগুলো খুব ঘন নয়। দাঙ্গাবাজের দলটা যদি আরও একটু নেমে আসে, ওরা দু'জন ঠিক ধরা পড়ে যাবে।

কী করবেন সুমিত্রা? কী করা উচিত? চিন্তাশক্তি আগেই লোপ পেয়ে গিয়েছিল। বিহ্বলের মতো তিনি শুধু তাকিয়ে রইলেন। পলকহীন। শ্বাসরুদ্ধ।

মাঝবয়সীর চোখ হননকারীদের দিকেই ছিল। ওদের অভিসন্ধি টের না পাওয়ার কারণ নেই। সে বুঝেছে, ম্যানগ্রোভের জঙ্গল বেশিক্ষণ তাদের আড়াল করে রাখতে পারবে না। দাঙ্গাবাজদের নজরে তারা পড়ে যাবেই। একটা শেষ চেষ্টা তাদের করতেই হবে।

মেয়েটিকে বুকের মধ্যে লেপটে রেখেই নিঃশব্দে, বসে বসেই এক পা এক পা করে মাঝবয়সী লোকটা খাড়িতে নেমে এল। ওধার থেকে যাতে বোঝা না যায়, তাই মাথাটা জলের ওপর যতটা সম্ভব ঝুঁকিয়ে এধারে এসে উঠল। খাড়ির এপাশে নারকেল গাছ, ঝোপঝাড়, কিছু ম্যানগ্রোভ। সে-সবের ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে মেরে ওরা যখন অনেকটা এগিয়ে এসেছে, সেই সময় দাঙ্গাবাজরা তাদের দেখতে পেয়ে গেল। উল্লাসে ফেটে পড়ে তারা। এতক্ষণের খোঁজাখুঁজি তা হলে ব্যর্থ হয়নি। হাতের অস্ত্রশস্ত্র মাথার ওপর তুলে ঘোরাতে ঘোরাতে ওরা খাড়ির দিকে ধেয়ে আসছে। এদিকে আধবুড়ো তার সঙ্গিনীকে নিয়ে ফের দৌড় শুরু করেছে।

সুমিত্রাদের বাড়ির চারপাশে কমপাউন্ড ওয়াল। মাঝবয়সী লোকটা আর যুবতী তাঁদের পেছন দিকের দেওয়ালের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। তারপর চকিতে বাঁ পাশে ঘুরে দেওয়ালের শেষ মাথায় এসে ডাইনে ঘুরে গেল। এধারেও রয়েছে দেওয়াল। খাড়ির ও-প্রান্ত থেকে এদিকটা দেখা যায় না। যুবতী আর আধবুড়োটা ওদের চোখের আড়ালে চলে গেছে।

সশস্ত্র দলটা খাড়ি পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে গেল। কিছুক্ষণ এদিক সেদিক তাকাল। তাদের উৎসাহ বুঝিবা ফুরিয়ে গেছে। কিংবা ভেবেছে মাত্র দুটো মানুষের জন্য এতটা এনার্জি নষ্ট করার মানে হয় না। বস্তির দিকে গেলে হাতের নাগালে আরও বহু শিকার মিলবে। বেশ হতাশ হয়েই তারা জঙ্গল-টঙ্গল পেরিয়ে টিলা বাইতে শুরু করল।

মনে মনে এটাই চাইছিলেন সুমিত্রা। চোখের সামনে দুটো জলজ্যান্ত মানুষ খুন হয়ে যাক, এটা তিনি ভাবতে পারছিলেন না। এতক্ষণে মনে হল, বম্বে শহরে আবার বাতাস বইতে শুরু করেছে। জোরে শ্বাস টানলেন তিনি।

দূরে বস্তি ঘিরে তাণ্ডব চলছেই। সেই আগুন। সেই হত্যা। সেই আর্তনাদ।

সুমিত্রা তাঁর বেডরুমের দিকে পা বাড়াতে যাবেন, সেই আধাবৃদ্ধ এবং তরুণীটির চিন্তা আবার মাথায় ফিরে এল। ওরা তো তাদের বাড়ির ডান পাশে গেছে। ওধারে একটা লম্বা গলি। সেটা চলে গেছে হাইওয়ের দিকে। হননকারীরা তো শুধু পেছনের বস্তিটার কাছেই নেই, অন্য দিকেও রয়েছে। তাদের কারও সামনে যদি তরুণী আর তার সঙ্গী পড়ে যায়? কোথায় ওরা গেল সেই কৌতূহল যেমন হচ্ছিল, তেমনি উৎকণ্ঠাও। ওরা যে গলিটায় ঢুকেছে সেদিকেও রয়েছে সুমিত্রাদের বাড়ির বাউন্ডারি ওয়াল। তেতলার ওধারের একটা ঘর থেকে গলিটা দেখা যায়।

কী ভেবে সুমিত্রা সেই ঘরটায় চলে এলেন। গলিটা কাঁচা। পিচ ঢেলে বাঁধাবার কথা কর্পোরেশন কখনও চিন্তা করেনি। দু'ধারে বড় বড় ঘাস, কিছু অগাছা। মাঝখান দিয়ে পায়ে চলা সরু পথ।

জানালার ধারে আসতেই চমকে উঠলেন সুমিত্রা। বাড়ির এধারের বাউন্ডারি ওয়ালটা একটু নিচু। আধবুড়ো লোকটা এর মধ্যে কখন যেন তরুণীটিকে দেওয়াল পার করে তাঁদের বাড়ির ভেতর নামিয়ে দিয়েছে। তারপর নিজেও দেওয়ালের মাথায় উঠেছে। উদ্দেশ্য, এপারে নেমে আসা।

ওপার থেকে সুমিত্রা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'এই এই, তোমরা ভেতরে ঢুকছ কেন?'

মূল বাড়ি থেকে রাউন্ডারি ওয়াল বেশ খানিকটা দূরে। সুমিত্রার গলা ওরা শুনতে পায়নি। আধবুড়ো লোকটা ততক্ষণে দেওয়াল পার হয়ে নেমে পড়েছে। ওখানে একটা বড় রেন-ট্রি। মেয়েটাকে আগলে ধরে গাছটার মোটা গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে বসল সে।

মেয়েটা ঠিক বসে থাকতে পারছিল না। ক্লান্তিতে, এতটা ছুটে আসার ধকল এবং প্রচণ্ড আতঙ্কে তার মাথা প্রৌঢ়টির কাঁধের ওপর এলিয়ে পড়েছে।

আত্মরক্ষার জন্য ওরা যে এই বাড়িটা বেছে নিয়েছে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কী করা উচিত, ভাবতে পারছিলেন না সুমিত্রা। বাড়িতে তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই। একটি ভয়ার্ত প্রৌঢ় এবং একটি তরুণীর পক্ষে তাঁর কতটুকু ক্ষতিই বা করা সম্ভব? বিশেষ করে এই সুরক্ষিত এলাকায়?

সুমিত্রা দুই আগন্তুকের দিক থেকে নজর সরাননি। অবধারিত মৃত্যুর গ্রাস থেকে বেরিয়ে এসে আপাতত হাঁপ ছেড়েছে ওরা। কিন্তু এই স্বস্তি কতক্ষণ? চিরকাল তো তাঁদের বাড়ির কমপাউন্ডে ওদের পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। হানাদারেরা দূরের ওই বস্তিটার কাছে শুধু নেই। ক'দিন ধরেই সুমিত্রা টের পাচ্ছেন, চারপাশে তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এখান থেকে বেরিয়ে আধবুড়োরা কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করলে হয়ত ছোরা, দা আর বল্লমের ফলায় মুহূর্তে তালগোল পাকানো রক্তাক্ত দুটো মাংসপিণ্ড হয়ে যাবে।

প্রৌঢ় লোকটা বিহ্বলের মতো এধারে-ওধারে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ সুমিত্রার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। তক্ষুনি হাতজোড় করে কী যেন বলতে লাগল সে। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। শুধু আন্দাজ করা যাচ্ছে, লোকটার চোখে-মুখে সকরুণ আকুলতা।

লোকটার থুতনিতে একগুচ্ছ দাড়ি, পরনে চাপা পাজামার ওপর লম্বা ঝুলের ঢোলা শার্ট, আর মেয়েটার গায়ে সালোয়ার কামিজ আর দোপাট্টা। চেহারা এবং পোশাক থেকে ওদের কী জাত আন্দাজ করা যাচ্ছে। এতক্ষণ এসব খেয়াল করেনি সুমিত্রা। আতঙ্কতাড়িত, তাড়া খাওয়া মানুষকে দেখে চিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল তাঁর। এই প্রথম খেয়াল হল, ওদের জাতের লোকেরাই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাঁর স্বামীকে ক'দিন আগে শেষ করে দিয়েছে। প্রৌঢ় আর মেয়েটার প্রতি

তাঁর সহানুভূতি বা করুণা লহমায় লোপ পেয়ে যায়। মাথার ভেতর শরীরের সব রক্ত উঠে এসে টগবগ করে ফুটতে থাকে। ক্রোধে। আক্রোশে। ঘৃণায়। এবং অসহ্য বিদ্বেষে।

হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো সুমিত্রা কী করে বসতেন, ঠিক নেই। হঠাৎ বাড়ির সামনের দিক থেকে হইচই ভেসে এল। মারাঠিতে একসঙ্গে অনেকে চিৎকার করে ডাকাডাকি করছে, 'দিদি— দিদি—'

দল বেঁধে কারা এসেছে? সচকিত সুমিত্রা আর কয়েক পলক মাঝবয়সী লোকটা আর মেয়েটিকে লক্ষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে ভেতর দিকের প্যাসেজের শেষ মাথায় চলে এলেন। এখানেই নিচে নামার সিঁড়ি। একতলায় বাইরের দিকে দরজায় খিল দেওয়া তো থাকেই। সেটার গায়ে কোলাপসিবল গেটে সারাক্ষণ তালাও লাগানো থাকে। একা, তাই সুরক্ষার এই ব্যবস্থা।

দরজা খুললেই মূল বাড়ির সামনের অংশে বাগান। বাগানের পর রাস্তার ওপর লোহার গেট। বম্বেতে রায়ট বাধার পর ওই গেটটাও ভেতর দিক থেকে তালাবন্ধ করে রাখা হয়। বাগানের মাঝখান দিয়ে নুড়ি বিছোনো একটা সরু পথ গেটে গিয়ে ঠেকেছে। কাজের লোকেরা এলে বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে। সুমিত্রা আগে দেখে নেন, তারপর তালা খোলেন।

কোলাপসিবল গেটের ফোকর দিয়ে সুমিত্রা দেখতে পেলেন, অনেকগুলো উত্তেজিত মুখ। সবার হাতেই নানা মারণাস্ত্র। যারা বস্তিতে হানা দিয়েছিল তাদেরই একটা দল এখানে হাজির হয়েছে। এদের অনেকেই মুখচেনা। একজনের নামও জানেন। সদাশিব সাঠে। সামান্য পরিচয়ও আছে। লোকটা এ-অঞ্চলের একটা রাজনৈতিক দলের প্রমুখ।

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাইছেন আপনারা?'

সদাশিবের সঙ্গীরা তুমুল চেঁচামেচি করছিল। সে তাদের থামিয়ে বলল, 'পেছনের ওই বস্তিটা থেকে কুত্তার পাল অনেকেই এধারে ওধারে ছিটকে পালিয়ে গেছে। সবগুলোকে ধরতে পারিনি। যেগুলো পালিয়েছে তাদের আমরা খুঁজছি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করছি সেখানে কেউ গেছে কিনা। আপনাদের বাড়িতে কেউ ঢুকেছে কি?'

মুখটা শক্ত হয়ে উঠল সুমিত্রার। দু'চোখ থেকে আগুন যেন ঠিকরে বেরোবে। স্নায়ুমণ্ডলী টান টান হয়ে গেছে। বার বার দিবাকরের কথা মনে পড়ছে। ব্লাস্টে তাঁর সারা শরীর এমন খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছিল যে চেনার মতো অবস্থায় ছিল না। শনাক্ত করার জন্য সুমিত্রাকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তিনি সেই দৃশ্য সহ্য করতে পারতেন না। পরক্ষণে বাড়ির পেছন দিকের সেই মাঝবয়সী লোকটির আতঙ্কগ্রস্ত চেহারা চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সেটা সরে গিয়ে লহমায় আবার দিবাকরের মুখ দেখা

যায়। একবার দিবাকর। একবার সেই লোকটা। ঘুরে ঘুরে দু'জনে আসছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত প্রৌঢ়ের ব্যাকুল মুখটা একেবারে স্থির হয়ে যায়।

সদাশিব সাঠে সমানে তাড়া দিয়ে যাচ্ছিল, 'কী হল দিদি, কিছু বলছেন না!'

সুমিত্রা বললেন, 'দেখছেন তো বাড়ি তালাবন্ধ। কেউ ঢুকবে কী করে?'

'এদিকটা তো বন্ধ। পেছন দিকে?'

'ওধারেও তালা দেওয়া আছে।'

'হুঁশিয়ার থাকবেন। আমরা মাঝে মাঝে এসে খবর নেব।'

সদাশিবরা চলে গেল।

কোলাপসিবল গেট ধরে তারপরও কিছুক্ষণ চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলেন সুমিত্রা। এর মধ্যে তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন। একসময় দরজা বন্ধ করে বাড়ির পেছনের অংশে চলে এলেন। এধারেও দরজায় তালা। কোলাপসিবল গেটে তালা। দুটো তালাই খুলে সোজা সেই রেন-ট্রিটার তলায় গিয়ে একদৃষ্টে প্রৌঢ় এবং তরুণীটিকে খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগলেন। তেতলা থেকে ততটা দেখা যায়নি। লোকটার শীর্ণ চেহারা, ভাঙা গাল, চোখের তলায় কালি, মোটা মোটা শিরা বার-করা হাত। খসখসে চামড়া। কণ্ঠমণিটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। সে হাতজোড় করেই আছে।

তরুণীটিও খুব রোগা। ফ্যাকাসে মুখ। এখন আর সে প্রৌঢ়টির কাঁধে মাথা রেখে পড়ে নেই। কোনও রকমে কুঁজো হয়ে বসে আছে। চোখে ত্রস্ত, ঘোলাটে দৃষ্টি।

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা এ-বাড়িতে ঢুকেছ কেন?' বলেই মনে হল এমন একটা অদ্ভুত প্রশ্ন তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল কী করে? কেন ওরা ঢুকেছে, তিনি কি আর জানেন না?

লোকটা শব্দ করে কেঁদে ওঠে। কান্নায় তার মুখ বিকৃত হয়ে যায়। জড়ানো, কাতর গলায় হিন্দিতে সে বলে, 'না ঢুকলে ওরা আমাদের খতম করে ফেলত মা'জি।'

'কী নাম তোমার?'

'জি, জহিরুল হক।'

তার সঙ্গিনীটির দিকে আঙুল বাড়ালেন সুমিত্রা, 'এ কে?'

জহিরুল বলল, 'আমার পুতহু— লেড়কার বিবি। ওর নাম আমিনা।'

কাছাকাছি কোত্থেকে যেন দাঙ্গাবাজদের হল্লা ভেসে এল। সন্ত্রস্ত জহিরুল বলল, 'মা'জি, আমরা খোলা আসমানের নিচে রয়েছি। এদিকে দু-তিনটে উঁচা উঁচা হাভেলি আছে। কেউ যদি ওখান থেকে আমাদের দেখে ফেলে—' শেষ না করে

থেমে গেল সে। বারকয়েক ঢোক গিলল। তার কণ্ঠমণিটা উৎকণ্ঠায় বা ভয়ে ওঠানামা করছে।

জহিরুলের ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছিলেন সুমিত্রা। তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশের মেয়ে। কুলশীল জন্মকুণ্ডলী ইত্যাদি মিলিয়ে বিয়েও হয়েছে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণত্বের যাবতীয় সংস্কার তো পেয়েছিলেনই, শ্বশুরবাড়িতে এসে সেগুলো আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। আরও প্রখর।

জহিরুল গলার স্বর অনেক নামিয়ে এবার বলল, 'আমাদের যা হবার তা তো হবেই। লেকেন আপনি বহুত মুসিবতে পড়ে যাবেন মা'জি।'

এদিকটা ভেবে দেখেননি সুমিত্রা। তিনি চমকে ওঠেন। হানাদারেরা কাছাকাছিই আছে। একবার এসে খোঁজও নিয়ে গেছে। কেউ হঠাৎ জহিরুলদের দেখে তাদের খবর দিলে ফলাফল আদৌ সুখকর হবে না। ওরা বাড়িতে ঢুকেছে অথচ তা জানানো হয়নি, যে মুহূর্তে দাঙ্গাবাজরা টের পাবে, তাঁকে রেয়াত করবে না। এমন মারাত্মক অপরাধের জন্য তাঁর ওপরও নির্ঘাত হামলা চালাবে। নিরুপায় সুমিত্রা বললেন, 'এসো—'

আমিনা ঘাড় গুঁজে বসে ছিল। জহিরুল তাকে ধরে ধরে দাঁড় করাল। আগে সেভাবে লক্ষ করেননি সুমিত্রা। এবার তাঁর চোখে পড়ল, মেয়েটি গর্ভবতী। অন্তত ন-দশ মাসের বাচ্চা রয়েছে তার পেটে।

বিমূঢ়ের মতো কয়েক পলক তাকিয়ে থাকেন সুমিত্রা। বলেন, 'এ কী! এই অবস্থায়—'

জহিরুল বলল, 'হাঁ মা'জি। বেটি মা হোনেবালি—'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন সুমিত্রা। পরক্ষণে সব দ্বিধা দু'হাতে ঠেলে ভীষণ ব্যস্তভাবে বললেন, 'চল আমার সঙ্গে।' ওদের দু'জনকে মূল বাড়ির ভেতর নিয়ে এসে খিড়কির দরজা বন্ধ করে দিলেন।

একতলাটা প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। দোতলায় কিচেন, ডাইনিং হল, গেস্ট রুম, ইত্যাদি। তেতলায় থাকেন সুমিত্রা।

একতলার কোণের দিকের একটা ঘরে এসে আলো জ্বালিয়ে সুমিত্রা বললেন, 'বসো—'

আসবাব বলতে এখানে ছোট একটা খাট, দু-তিনটে চেয়ার, স্টিলের একটা আলমারি, তিন-চারটে বেতের মোড়া। সবই বহুকালের পুরনো এবং বাতিল।

জহিরুল এবং আমিনা জড়সড় হয়ে মেঝেতে বসে পড়ল। সুমিত্রা লক্ষ করলেন, মেয়েটার চোখ আধবোজা। ভীষণ হাঁফাচ্ছে সে। শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে তার। জহিরুলকে বললেন, 'নিচে না, তোমার ছেলের বউকে খাটে শুইয়ে দাও।'

বিহ্বলের মতো তাকিয়ে থাকে জহিরুল। শুধু বাড়িতে এনে আশ্রয়ই দেননি সুমিত্রা, আমিনাকে খাটে শুইয়ে দেওয়ার কথা বলছেন। শুনেও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

সুমিত্রা বললেন, 'কী হল, আমার কথা শুনতে পাওনি?'

'হাঁ মা'জি—' 'শশব্যস্ত জহিরুল আমিনাকে হাত ধরে খাটে শুইয়ে দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ে।

যেখানে বস্তিটা জ্বলছে সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই ওখানে থাকতে?'

'জি—'

'আর কে কে আছে তোমার?'

'আমার দো লেড়কা, আর বিবি।' জহিরুল আমিনাকে দেখিয়ে বলতে লাগল, 'এ বেটি আমার বড় লেড়কার বিবি। ছোটে লেড়কার শাদি হয়নি।'

সুমিত্রা জানতে চাইলেন, 'তোমার বিবি আর ছেলেরা কোথায়?'

'ঘরে আগ লাগাবার পর জান বাঁচাতে যে যেদিকে পেরেছে পালিয়ে গেছে। উপরবালা জানে তারা বেঁচে আছে কি না।'

সুমিত্রা উত্তর দিলেন না।

আমিনা সম্পর্কে জহিরুল এবার বলে, 'এ বেটির তবিয়তে এমন তাকত নেই যে পালাতে পারে। হত্যারাদের (খুনিদের) তাড়া খেয়ে কীভাবে যে আপনাদের হাভেলি পর্যন্ত পৌঁছেছি। তা শুধু আমিই জানি।'

কথায় কথায় জানা যায়, জহিরুলদের বাড়ি বিহারের মজঃফরপুরে। গরিবের চাইতেও তারা গরিব। এক ধুর জমিও তাদের নেই। পরের খেত কুপিয়ে, লাঙল চালিয়ে, বীজ রুয়ে এবং ফসল কেটে জমি-মালিকের খলিহানে তুলে দিয়ে যা মজুরি পাওয়া যেত তাতে দু'বেলা ভরপেট খাওয়া জুটত না। তা ছাড়া, জমির কাজ মাত্র চার মাসের। বছরের বাকি আটটা মাস কী কষ্টে যে দিন কাটত! বেঁচে থাকার জন্য কত রকম উঞ্ছবৃত্তি যে করতে হত!

কার কাছে যেন জহিরুল শুনেছিল, বম্বেতে প্রচুর কাজ। কেউ বসে থাকে না। ওই শহরে হাওয়ায় টাকা উড়ছে। সেখানে যাবে কি যাবে না, ভাবতেই এক সাল কেটে গিয়েছিল। তারপর মরিয়া হয়েই দুই ছেলে আর বিবির হাত ধরে বম্বের ট্রেনে উঠেছে।

এই শহর তাদের নিরাশ করেনি। সত্যিই এখানে অঢেল টাকা, অজস্র কাজের সুযোগ। বম্বে শহরকে ঘিরে একশো মাইলের মধ্যে কত যে কল-কারখানা! তা ছাড়া, তৈরি হচ্ছে বিশাল বিশাল বিল্ডিং কমপ্লেক্স। এই সব বাড়িতে হাজার হাজার ফ্ল্যাট।

জহিরুল এবং তার দুই ছেলে রশিদ আর জামাল একটা বড় কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে মজুরের কাজ পেয়ে গেল। তিন বাপ ছেলে মিলে যা মজুরি পায়, মজঃফরপুরে স্বপ্নেও তারা তা ভাবতে পারত না। কিন্তু বম্বে শহরে রোজগার যেমন বিরাট, খরচও তেমনি। চাল, ডাল, আটা, সবজি, মাছ-মাংস, সমস্ত আগুন। সব চেয়ে বড় সমস্যা হল মাথা গোঁজার জায়গা। সংসারের খরচখরচা চালিয়ে জহিরুলদের মতো মানুষের পক্ষে বস্তি বা ঝোপড়পট্টিতে থাকা ছাড়া উপায় নেই। ওরা দূরের ওই বস্তিটাতেই ক'বছর আছে, বা ছিল। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে পোস্ট অফিসে কিছু টাকাও জমিয়েছে।

সব মানুষেরই কিছু না কিছু স্বপ্ন থাকে। বড় মানুষের বড় স্বপ্ন। জহিরুলের মতো সামান্য মানুষের স্বপ্নটা খুবই ছোটমাপের। টাকা জমানোর পর বছর দুই আগে বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছিল। নাতি-নাতনি হবে। নতুন নতুন বংশধরে ঘর ভরে যাবে। স্বপ্নপূরণের কাছাকাছি চলে এসেছিল তারা। আজ লহমায় পুড়ে ঝুড়ে সব শেষ।

শুনতে শুনতে বুকের ভেতর চাপা কষ্ট অনুভব করতে থাকেন সুমিত্রা।

খাটে শুয়ে মাঝে মাঝে এতক্ষণ ক্ষীণ শব্দ করে উঠেছিল আমিনা। এবার তার গলার ভেতর থেকে গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে এল।

আমিনার দিকে তাকিয়ে জহিরুল বলল, 'অনেকটা রাস্তা টিলার ওপর দিয়ে দৌড়ে এসেছে। বহুত তখলিফ হচ্ছে। কিছুক্ষণ জিরোতে পারলে সামলে নেবে।'

সুমিত্রা উত্তর দিলেন না।

জহিরুল বলল, 'মা'জি মেহেরবানি করে বেটিকে একটু দেখবেন। আমি জানি, আপনার কাছে ওর কোঈ ডর নেহী। আমাকে এবার বেরোতে হবে।'

সুমিত্রা চমকে ওঠেন, 'বাইরে যা চলছে এখন বেরিও না। ভীষণ বিপদে পড়ে যাবে।'

জহিরুল বলল, 'মা'জি বেটির একটা বন্দোবস্ত হয়েছে। লেকেন আমার লেড়কা দুটো আর তাদের আম্মী কোথায়, কোন দিকে গেছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। ওদের খোঁজ না পেলে ঠিক থাকতে পারছি না।' হাত জোড় করে সে জানায়, তার বুকের ভেতরটা ভেঙেচুরে যাচ্ছে। মা'জি যেন তাকে বাধা না দেন। স্ত্রী এবং ছেলেদের সন্ধান নিয়ে তাদের সঙ্গে করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবে সে।

জহিরুলকে আটকানো গেল না। আমিনার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে একরকম দৌড়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

আমিনা কাতর, করুণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আব্বু—আব্বু—'

তার কথা যেন শুনতেই পেল না জহিরুল। সুমিত্রা পিছু পিছু বাড়ির পেছনে

দিকের দরজা পর্যন্ত চলে এসেছিলেন। উদ্বিগ্ন। আতঙ্কগ্রস্ত। লোকটা যা করতে চলেছে তার একটাই পরিণতি — অবধারিত মৃত্যু। তিনি ডাকতে লাগলেন, 'শোনো— শোনো—'

জহিরুল ফিরেও তাকাল না। উন্মাদের মতো দৌড়তে দৌড়তে পেছনের ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে বাউন্ডারি ওয়াল টপকে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্তব্ধ হয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সুমিত্রা। তারপর কোলাপসিবল গেটে তালা দিয়ে, দরজার পাল্লায় খিল লাগিয়ে সেই কোণের ঘরটিতে ফিরে এলেন। আমিনা কাত হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে ছিল। নির্জীব গলায় বলল, 'আব্বুকে রুখতে পারলেন না?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন সুমিত্রা, 'পারলাম আর কই?'

আমিনা আর কোনও প্রশ্ন করে না। নিষ্ঠুর নসিবের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে চুপ করে থাকে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর ফের সেই গোঙানিটা তার গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে তীব্র যন্ত্রণা সামলাতে চেষ্টা করছে সে। তার মুখটা বেঁকেচুরে যাচ্ছে যেন।

উদ্বিগ্ন সুমিত্রা অনেকখানি ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'জি—' পেটে হাত রেখে আমিনা বলল, 'বহোৎ দর্দ। মনে হচ্ছে ভেতরটা ছিঁড়ে পড়ছে।'

গত কয়েক সপ্তাহে কত কিছুই তো ঘটে গেছে। সবই ভয়াবহ। আতঙ্কজনক। বিস্ফোরণ। স্বামীর মৃত্যু। রায়ট। জীবন আমূল বদলে গেছে সুমিত্রার। কিন্তু এমন বিপন্ন আগে আর কখনও হননি। আমিনাকে নিয়ে তিনি কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, দু-এক দিনের ভেতরে মেয়েটার বাচ্চা হবে। অথচ তার আপনজনেরা কেউ কাছে নেই। বস্তিতে আগুন লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে ওর স্বামী, দেওর আর আর শাশুড়ি কে কোথায় পালিয়েছে, কে জানে। আদৌ বেঁচে আছে কি না, তারও ঠিক নেই। শ্বশুর মেয়েটার, দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দিয়ে স্ত্রী আর ছেলেদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। তার মৃত্যুও প্রায় অবধারিত।

সুমিত্রার মাথার ভেতরটা ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন। কাল কাজের লোকেরা এসে আমিনাকে দেখলে তাঁকে ভীষণ বিপাকে পড়ে যেতে হবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হবে ধুমলকে নিয়ে। ভীষণ গোঁড়া ব্রাহ্মণ। সে যে কী করে বসবে, ভাবতেও সাহস হয় না।

কিন্তু কালকের কথা কাল। অসাড় মস্তিষ্ক যেন কাজ করছে না। তবু তারই মধ্যে সুমিত্রার মনে হল, এই মুহূর্তে আমিনার জন্য একজন ডাক্তার ডাকা ভীষণ জরুরি।

তঁরা কাছে পেইন কিলার জাতীয় কিছু ট্যাবলেট আছে। কিন্তু গর্ভিণী একটি মেয়েকে তা দেওয়া ঠিক হবে কি না, তিনি জানেন না। হয়ত মারাত্মক ক্ষতিকারক হয়ে ডঠবে।

হঠাৎ শালিনী কুলকার্নির কথা মনে পড়ল সুমিত্রার। শালিনী ডাক্তার। তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু। নাগপুরে তাঁরা একই পাড়ায় থাকতেন। একই স্কুলে এবং কলেজে পড়েছেন। সুমিত্রা আর্টসের ছাত্রী। হিস্ট্রি অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট। আর শালিনী বি. এসসি পাস করে মেডিকেল কলেজে পড়তে যান। ডাক্তার হওয়ার পর বম্বের একটা প্রাইভেট হাসপাতালে চাকরি নিয়ে চলে এসেছিলেন। বিয়ে করেন নি। আগে হাসপাতাল কোয়ার্টার্সেই থাকতেন। ক'বছর হল আন্ধেরি ইস্টে বড় ফ্ল্যাট কিনেছেন। সেখান থেকেই এখন হাসপাতালে যাতায়াত করেন।

বিয়ের সূত্রে সুমিত্রাও বম্বেতে এসেছেন। দুই বন্ধুর সম্পর্কটা ছেলেবেলার মতোই গভীর। শালিনী হাসপাতালে রোগী-টোগি নিয়ে এত ব্যস্ত যে ঘন ঘন তাঁর কাছে আসতে পারেন না। সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়ায় সুমিত্রার পক্ষেও নিয়মিত আন্ধেরিতে যাওয়া সম্ভব হয় না। তবে প্রায়ই ফোনে তাঁদের কথা হয়।

শালিনীকে তাঁর সমস্যাটা বুঝিয়ে বললে নিশ্চয়ই এক্ষুনি চলে আসবেন। দাঙ্গাকারীরা ডাক্তারের গাড়ি খুব সম্ভব আটকাবে না। শালিনী খুব সাহসী। বুদ্ধিমতী। তিনি অবশ্যই হানাদারদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চলে আসতে পারবেন।

আমিনা খাটের ওপর সমানে ছটফট করছিল। কত আর বয়স। উনিশ কি কুড়ি। তাঁর মেয়ের চাইতেও অনেক ছোট। তাকে দেখতে দেখতে বড় মায়া হতে লাগল সুমিত্রার। বললেন, 'তুমি একটু সহ্য কর। আমি এখনই আসছি।' বলেই ত্বরিত পায়ে বেরিয়ে গেলেন। সিঁড়ি ভেঙে সোজা তেতলায় শোবার ঘরে গিয়ে টেলিফোন তুলে ডায়াল করতে শালিনীর সারাক্ষণের কাজের মেয়ে রেণুর গলা ভেসে এল। সে তাঁর কণ্ঠস্বর চেনে। মারাঠিতে বলল, 'দিদি, শুনলাম আপনাদের দিকে গণ্ডগোল হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।' সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে সুমিত্রা বললেন, 'শালিনী কি বাড়িতে আছে, না হাসপাতালে?'

তাঁর প্রশ্নটা যেন কানেই ঢুকল না রেণুর। উদ্বেগের সুরে বলতে লাগল, 'অনেক খুনটুন হয়ে গেছে। আগুন লাগিয়ে বস্তি টস্তি জ্বালিয়ে দিচ্ছে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রূঢ়ভাবে সুমিত্রা বললেন, শালিনী বাড়িতে থাকলে ফোনটা তাকে দাও।'

রেণু বোধহয় হকচকিয়ে গিয়েছিল। বলল, 'দিদি তো বম্বেতে নেই।'

'সে কী! চার-পাঁচ দিন আগেও তো ওর সঙ্গে কথা বলেছি। কোথায় গেছে?'

'হাসপাতালের একটা দরকারি কাজে দিল্লি গেছেন।'

আকাশ যেন খান খান হয়ে মাথার ওপর ভেঙে পড়ে। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন সুমিত্রা। তারপর বললেন, 'কবে ফিরবে?'

রেণু বলল, 'কাল।'

এইটুকুই যা আশার কথা। কাল পর্যন্ত আমিনাকে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মতো শুশ্রূষা করে সুস্থ রাখতেই হবে। সুমিত্রা বললেন, 'শালিনী ফিরে এলেই আমাকে ফোন করতে বলো। খুব দরকার। মনে থাকবে?'

'নিশ্চয়ই থাকবে। আপনি—'

রেণু আরও কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই লাইন কেটে দিলেন সুমিত্রা। ফোন নামিয়ে রেখে ফের তাঁকে আমিনার কাছে যেতে হবে। দরজা পর্যন্ত গেছেন, বাধা পড়ল। টেলিফোন বেজে উঠেছে। ফিরে এসে সেটা তুলে নিলেন। মিস্টার কাপাডিয়া। কাছাকাছি একটা হাই-রাইজে থাকেন। বিজনেসম্যান। সুমিত্রাদের খুবই পরিচিত।

এই অঞ্চলে দাঙ্গা শুরু হয়েছে। সশস্ত্র হানাদাররা চারদিক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কাপাডিয়া সুমিত্রার জন্য ভীষণ উৎকণ্ঠিত। জানতে চাইলেন, ওঁদের কেউ এসে রাতটা সুমিত্রাদের বাড়িতে থাকবেন কি না।

আমিনার মুখ চকিতে মনে পড়ে যায় সুমিত্রার। কাপাডিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, 'এখন দরকার নেই। তেমন বুঝলে আমিই আপনাকে জানাব।' ফোন নামিয়ে রাখতে না রাখতেই আবার সেটা বেজে ওঠে। এবার মহেশ পাটিল। তিনিও স্থানীয় বাসিন্দা। তাঁর একই বক্তব্য। এখনই স্ত্রীকে সঙ্গে করে চলে আসতে চান। পাটিলকেও ধন্যবাদ জানিয়ে আপাতত ঠেকালেন সুমিত্রা। ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নামতে নামতে ভাবলেন, এমন ফোন অনবরত আসতে থাকবে। এই এলাকার মানুষজন তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী। সবাই তাঁকে সাহায্য করতে চান। দাঙ্গা যদি চলতে থাকে, কতদিন তাঁদের ঠেকনো সম্ভব হবে, কে জানে।

একতলায় কোণের ঘরে এসে সুমিত্রা দেখলেন, আমিনা অনেকটা সামলে নিয়েছে। গোঙানি বন্ধ হয়েছে। পেটে হাত রেখে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে।

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যথা কমেছে তো?'

ক্ষীণস্বরে আমিনা বলল, 'জি—'

'এমন কষ্ট আগেও হয়েছে?'

'জি—'

'ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'জি—'

আমিনা জানাল, এই সপ্তাহেই স্বামীর সঙ্গে তার হাসপাতালে যাওয়ার কথা ছিল।

এই মুহূর্তে কী করণীয়, দ্রুত ভেবে নিলেন সুমিত্রা। কাল সকালে ধুমল এসে হাজির হবে। তারপর ট্রেন চললে অন্য কাজের লোকেরা। তাদের চোখের আড়ালে আমিনাকে রাখতে হবে। এ তো গেল একটা দিক।

আরেক দিকে রয়েছে জহিরুল। সে কখন ফিরবে, আদৌ ফিরবে কি না, কে জানে। না ফিরলে রাত্রিবেলা আমিনাকে তাঁর কাছাকাছি কোথাও রাখা খুব জরুরি। ফের যদি ব্যথা হয় তখন তাকে দেখাশোনা করতে হবে। জহিরুল তাঁকে কী বিপদেই যে ফেলেছে!

মেয়েটাকে কাছাকাছিই বা রাখবেন কীভাবে? তিনি থাকবেন তেতলায়। আমিনা একতলায় পড়ে থাকলে টেরই পাবেন না মেয়েটার কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না। একটাই পথ অবশ্য খোলা আছে। আমিনাকে যদি তাঁর শোবার ঘরের পাশের ছোটি ঘরটায় রাখা যায়। রাত্তিরে মাঝে মাঝে উঠে তাকে দেখে আসতে পারবেন। তা ছাড়া, সকালে ধুমলরা এলে আমিনাকে দেখতে পাবে না। না ডাকলে কাজের লোকেরা তেতলায় ওঠে না। অবশ্য ঘর ধোয়া-মোছার একটা ব্যাপার আছে। সেই সময় ঘাটি বাঈটি, যার নাম দুর্গা, ওপরে যায়। তাকে জানিয়ে দেবেন কাল তেতলা সাফ করার দরকার নেই।

যে সমস্যা প্রবল আকার নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে তার মোটামুটি সন্তোষজনক একটা সমাধানের সন্ধান পেয়ে স্বস্তি বোধ করতে যাবেন, হঠাৎ খেয়াল হল, আমিনাকে তেতলায় নিয়ে যাবেন কী করে? সেখানে একটা ঘরে রয়েছে সিদ্ধিদাতা গণপতি আর বিষ্ণুর মূর্তি। তলোয়ারকররা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। এই বংশে পুরুষানুক্রমে রোজ ওই দুই দেবতার পূজো হয়ে আসছে। পরিবারের কোনও একজনকে সেটা করতে হয়। এই বংশের তাই নিয়ম। একদিনের জন্যও এতে ছেদ পড়েনি। দিবাকর যতদিন বেঁচেছিলেন, তিনিই পুজোটা করতেন। এখন সেই দায়িত্ব সুমিত্রার।

যেখানে দুই দেবতার মূর্তি স্থাপিত, আমিনাকে সেখানে কী করে নিয়ে যাবেন সুমিত্রা? সে গেলে ওখানকার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। গোঁড়া তলোয়ারকর বংশের পরলোকনিবাসী পূর্বপুরুষদের আত্মারা তাঁর ওপর ভীষণ রুষ্ট হবেন। পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুলের ব্রাহ্মণত্বের যে গোঁড়ামি তাঁর হাড়েমজ্জায় ঢুকে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে, শত হাতে তাঁকে বাধা দিতে লাগল।

কিছুক্ষণ স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সুমিত্রা। তারপর কী যেন তাঁর ওপর ভর করে বসে। প্রবল এবং অপ্রতিরোধ্য জন্মগত যাবতীয় সংস্কার ঠেলে সরিয়ে তিনি বলেন, 'আমিনা আস্তে আস্তে ওঠো।'

হাতের ভর দিয়ে নির্দেশমতো উঠে বসল আমিনা। সুমিত্রা বললেন, 'এবার চলো আমার সঙ্গে—'

কোনও প্রশ্ন করল না আমিনা। নিঃশব্দে সুমিত্রার পেছন পেছন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু সন্তানের ভার পেটে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তার।

সুমিত্রা লক্ষ করলেন, পা ঠিকমতো ফেলতে পারছে না আমিনা, বার বার টলে যাচ্ছে। এই অবস্থায় মেয়েটা যদি হুড়মুড় করে পড়ে যায় তার তো চরম ক্ষতি হবেই, তিনি নিজে আরও মারাত্মক সঙ্কটে পড়ে যাবেন। এক লহমার দ্বিধা, তারপর আমিনার পিঠটা হাতের বেড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে ওপরে উঠতে লাগলেন।

তেতলার বড় একটা হল-ঘরের এক প্রান্তে পুজোর ঘর। সেখানে বিষ্ণু আর গণপতির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অন্য প্রান্তে পর পর চারটে বেড-রুম। দুটো বেশ বড়, একটা মাঝারি এবং একটা ছোট।

তেতলায় আসতেই নিজের অজান্তে একবার পুজোর ঘরটার দিকে চোখ চলে গেল সুমিত্রার। সন্ধে হওয়ার আগে আগেই ওখানে রোজ আলো জ্বালিয়ে ধূপকাঠি জ্বেলে দেন। ধূপকাঠিগুলো পুড়ে গেছে কিন্তু তার মৃদু সুগন্ধ এখনও তেতলার বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

পাথরের তৈরি দুই দেবমূর্তির দিকে তাকিয়ে মনে মনে সুমিত্রা বললেন, 'তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।' তারপর হল পেরিয়ে তাঁর বেডরুমের পাশের ছোট ঘরটিতে চলে এলেন। খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল দিয়ে ঘরটা সাজানো। রয়েছে অ্যাটাচড বাথরুম।

একতলা থেকে তেতলা পর্যন্ত মোট ষাটটা সিঁড়ি। এতগুলো সিঁড়ি ভাঙতে ভীষণ হাঁপিয়ে গিয়েছিল আমিনা। জোরে জোরে শ্বাস টানতে লাগল সে।

সুমিত্রা সযত্নে তাকে খাটে বসিয়ে বললেন, 'খানিকক্ষণ জিরিয়ে নাও।' বাথরুমের দরজা দেখিয়ে বলেন, 'ওটা গোসলখানা। জিরনো হলে হাতমুখ ধুয়ে আসবে।'

বাধ্য মেয়ের মতো মাথা হেলিয়ে দেয় আমিনা, 'জি—'

'গোসলখানায় তোয়ালে, সাবান সব আছে।'

'জি—'

সুমিত্রা এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কখন খেয়েছ?'

মুখ নিচু করে আমিনা বলল, 'দুফারে—'

'অনেক আগে খেয়েছ। নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে।'

আমিনা উত্তর দিল না।

সুমিত্রার মনে হল, মেয়েটা লাজুক। খাওয়ার কথায় তার সঙ্কোচ হচ্ছে। তিনি আর কিছু বললেন না। ওর জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসতে হবে। দরজার দিকে পা বাড়িয়েছেন, পেছন থেকে আমিনা ডাকল, 'মা'জি—'

দাঁড়িয়ে গেলেন সুমিত্রা, 'কিছু বলবে?'

'আমার শাস (শাশুড়ি) আর ওদের দুই ভাইয়ের খবর নিয়ে আব্বু তো ফিরে এল না।'

সুমিত্রা বুঝতে পারলেন, পেটে সন্তান বহনের অশেষ ক্লেশ তো রয়েছেই। সেই সঙ্গে প্রিয়জনদের জন্য প্রচণ্ড উৎকণ্ঠাও ভোগ করছে মেয়েটা। কী বলবেন, ভেবে পেলেন না।

আমিনা এবার বলল, 'আব্বু কি ফিরে আসবে না মা'জি?'

এই আশঙ্কাটা সুমিত্রারও। জহিরুল যদি স্ত্রী আর ছেলেদের খোঁজে ওই জ্বলন্ত বস্তিটার দিকে গিয়ে থাকে ধারাল দায়ের কোপে, ছোরা আর বর্শার ফলায় এবং লাঠির ঘায়ে তার শরীর এতক্ষণে রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে, কিন্তু এ কথা তো আমিনাকে বলা যায় না।

সুমিত্রা জানালেন, বস্তিতে আগুন লাগানোর কারণে কে কোথায় পালিয়ে গেছে তার তো ঠিক নেই। দুই ছেলে আর বিবিকে খুঁজে বার করতে সময় লাগছে জহিরুলের। ভরসা দেওয়ার সুরে বললেন, 'নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। চিন্তা করো না।'

আর দাঁড়ালেন না সুমিত্রা। দোতলায় তাঁদের কিচেন। পাশেই ডাইনিং হল। সেখানে হট কেসে তাঁর জন্য রাতের খাবার রেখে ধুমল চলে গেছে।

একটু ইতস্তত করলেন সুমিত্রা। আমিনাকে জড়িয়ে ধরে একতলা থেকে ওপরে নিয়ে এসেছেন। মেয়েটার স্পর্শ তাঁর শাড়িতে জামায় লেগে আছে। এই পোশাকে খাদ্যবস্তুগুলো বার করবেন? দ্বিধাটা এবারও কাটিয়ে উঠলেন। একটা প্লেটে খাবার এবং গেলাসে জল ভরে তেতলায় আমিনার ঘরে চলে এলেন। একটা সাইড টেবল টেনে এনে প্লেট গেলাস তার ওপর রেখে ডাকলেন, 'আমিনা—'

শুয়ে শুয়ে খোলা জানালা দিয়ে দূর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল আমিনা। আস্তে আস্তে উঠে বসল।

পাশের ঘরে, অর্থাৎ সুমিত্রার বেড-রুমে টেলিফোন বেজে উঠল। নিশ্চয়ই কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী। ব্যস্তভাবে তিনি বললেন, 'তুমি যাও, আমি এক্ষুনি আসছি।'

আওয়াজ শুনেই মনে হচ্ছে, দূরের কোনও ফোন। লং ডিসটান্স কল। সেটা তুলে নিতেই মেয়ে, অর্থাৎ মাধুরীর গলা ভেসে এল।

'মা, বম্বের অবস্থা আজ কেমন?'

'একই রকম।'

মাধুরী জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের ওদিকটায় কোনও গোলমাল হয়নি তো?'

উত্তর দিতে গিয়ে থমকে গেলেন সুমিত্রা। আজ যা ঘটেছে এবং এখনও ঘটে চলেছে সে সব জানালে মেয়েটা ভয়ে, আতঙ্কে, দুশ্চিন্তায় কী যে করে বসবে, কে জানে। তার ওপর আমিনার ব্যাপারটা বললে একেবারে পাগল পাগল হয়ে যাবে। এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারবে না।

সুমিত্রা বললেন, 'না। এখানে কিছু হয়নি।'

মাধুরী বলল, 'তোমাকে আগেই বলেছিলাম মা, বম্বেতে থাকার দরকার নেই। মাস দুয়েকের মধ্যে আমরা আসছি। বাড়িটাড়ি বিক্রি করে তোমাকে আমাদের কাছে নিয়ে আসব।'

'ঠিক আছে। আগে আয় তো, তখন দেখা যাবে।'

মাসখানেক আগে মাধুরীর একটি মেয়ে হয়েছে। মাধুরী ফোন করলেই নাতনি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চান সুমিত্রা। আজও প্রচুর খোঁজখবর নিলেন। শিশুকে কীভাবে যত্ন করতে হবে, সে সম্বন্ধে অজস্র উপদেশ দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই আর রাজদীপ ভাল আছিস তো?' রাজদীপ তাঁর জামাই।

মাধুরী বলল, 'হ্যাঁ। আমাদের জন্যে চিন্তা করো না। তুমি সাবধানে থেকো।'

মেয়ের সঙ্গে কথা বলে জানালার পাশের সেই চেয়ারটায় গিয়ে বসলেন সুমিত্রা। ওটা পশ্চিম দিক। ওধারেই হাইওয়ে, সমুদ্র, জেলেদের আস্তানা। ভীষণ ক্লান্তি বোধ করেছিলেন তিনি। আমিনার চিন্তাটা মাথার ওপর পাষাণভারের মতো চেপে বসেছে।

এই ঘরের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের জানালাগুলো খোলা রয়েছে। সুমিত্রার চোখ পশ্চিমে, সমুদ্রের দিকে। অন্যমনস্কর মতো ভাবছিলেন, এখন তিনি কী করবেন। আমিনার ছোঁয়া জামা-কাপড়ে লেগে আছে। সেগুলো ছেড়ে স্নানটান করে শুদ্ধ হয়ে নেবেন কি? পরক্ষণে খেয়াল হল, রাতটা যে নির্বিঘ্নে কাটবে, তেমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। এমনও হতে পারে, আমিনার আবার ব্যথা উঠল। তখন ফের শুশ্রূষার জন্য তার গায়ে হাত দিতে হবে। যত বার ছোঁবেন তত বার স্নান করা কি সম্ভব? স্নানের চিন্তাটা তিনি আপাতত স্থগিত রাখলেন।

হঠাৎ উত্তর দিকের জানালার বাইরে নজর যেতে চমকে উঠলেন সুমিত্রা। অনেক দূরে আগুনের ঝলক দেখা যাচ্ছে। আকাশ লালে লাল। সেই সঙ্গে হল্লার শব্দ ভেসে আসছে। দাঙ্গা তা হলে ওধারে ছড়িয়ে পড়ল!

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ বসে থাকার পর সুমিত্রা উঠে পড়লেন। আমিনা একা রয়েছে। একে নতুন জায়গা। তার ওপর স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়িদের নিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত সীমাহীন আতঙ্কে কাটছে মেয়েটার। ওর কাছে থাকা দরকার।

পাশের ঘরে এসে সুমিত্রা দেখলেন, নীরবে বসে আছে আমিনা। প্লেটে হাত দেয়নি সে। যেমন খাবার তেমনি পড়ে আছে।

সুমিত্রা বললেন, 'এ কি, কিছুই তো খাওনি। খালি পেটে থাকা ঠিক নয়। খাও— খাও—'

ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল আমিনার। চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল বেরিয়ে আসছে। ধরা ধরা, ঝাপসা গলায় সে বলল, 'খেতে ইচ্ছে করছে না। আব্বু তো আম্মী আর ওদের দু'ভাইকে নিয়ে এখনও এল না?'

আগের মতোই ভরসা দিলেন সুমিত্রা, 'আসবে, আসবে। তুমি খেয়ে নাও।'

অনেক বোঝানোর পর সামান্য কিছু খেল আমিনা। তারপর প্লেট থেকে হাত তুলে নিয়ে বলল, 'আর খেতে পারছি না।'

এবার জোর করলেন না সুমিত্রা। 'যাও, গোসলখানা থেকে আঁচিয়ে এসে শুয়ে পড়।'

বাথরুম থেকে ফিরে বাধ্য মেয়ের মতো খাটে শুল আমিনা। সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন আর কষ্ট হচ্ছে না তো?'

আস্তে মাথা নাড়ে আমিনা, 'জি, না—'

'অনেক রাত হয়েছে। আর জেগে থেকো না। ঘুমিয়ে পড়। আমি পাশের ঘরেই আছি। মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব। কোনও ভয় নেই।'

'লেকেন—'

'কী?'

'আপনার হাভেলির গেট তো বন্ধ। ওরা এসে পড়লে—'

আমিনাকে থামিয়ে দিলেন সুমিত্রা, 'আমি নজর রাখব। ওরা এলে গেট খুলে তোমার কাছে নিয়ে আসব।' বেশি পাওয়ারের লাইটটা নিভিয়ে, নীলাভ নাইট ল্যাম্প জ্বেলে, প্লেট আর গেলাস তুলে বাইরে এলেন। এ-ঘরের দরজা খোলাই রইল। রাতে আমিনা ডাকাডাকি করলে শুনতে পাবেন। নিজের ঘরের দরজাও আজ তাঁকে খোলা রাখতে হবে।

সোজা দোতলায় চলে এলেন সুমিত্রা। ডাইনিং হল পেরিয়ে কিচেনের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। রাতের এঁটো প্লেট ট্লেট তিনি কিচেনের সিঙ্কে রেখে দেন। পরদিন দুর্গা এসে ধোয়। কিন্তু যে গেলাসে, প্লেটে মুসলমানের উচ্ছিষ্ট রয়েছে তা কি ব্রাহ্মণের রান্নাঘরে নেওয়া যায়? সব সংস্কার বুঝিবা রাতারাতি কাটিয়ে ওঠা যায় না। কী ভেবে হাতের প্লেট, গেলাস হলের এক কোণে রেখে দিলেন। তারপর নিজের বেড-রুমে এসে স্নান সেরে, পোশাক পালটে ফের দোতলায়।

ডাইনিং হলে তাঁদের ফ্রিজটা থাকে। সেটা থেকে পাউরুটি চিজ আর কলা একটা বড় ট্রেতে নিয়ে আবার এলেন নিজের ঘরে।

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে এক সময় শুয়ে পড়লেন সুমিত্রা। কান রইল পাশের ঘরের দিকে। উত্তর এবং পুব দিক থেকে হল্লার আওয়াজ আসছে। বোঝা যাচ্ছে, রাতভর তাণ্ডব চলবে।

শুয়ে আছেন ঠিকই, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। চোখ জ্বালা করছে, জহিরুলরা কি দূরের ওই হননপুরী থেকে ফিরে আসতে পারবে? যদিও সুমিত্রা জানেন, সেটা নেহাতই দুরাশা, অলীক স্বপ্নমাত্র, তবু শুয়ে থাকতে পারলেন না। জগতে অলৌকিক ঘটনাও তো ঘটে।

বিছানা থেকে নেমে সমুদ্রের দিকের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন সুমিত্রা। হাইওয়ে, এদিকের রাস্তাঘাট, সব শুনশান। কেউ কোথাও নেই। এমনকি দাঙ্গাবাজদেরও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তিনি চলে এলেন পেছন দিকের সেই ঘরটায়। জানালাগুলো খোলাই ছিল। তাঁদের কমপাউন্ডের ভেতর সামনে পেছনে এবং দু'পাশে সারারাত আলো জ্বলে। জানালার গ্রিলে মুখ ঠেকিয়ে নিচে তাকালেন। তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করতে লাগলেন। জহিরুলরা কেন, মনুষ্য জগতের কোনও প্রাণীর চিহ্নমাত্র সেখানে নেই। দু'পাশের ঘরের জানালা দিয়েও দেখে নিলেন। ওই দু'দিকেও কাউকে দেখা গেল না।

সুমিত্রা নিজের ঘরে ফিরে আবার শুয়ে পড়লেন। সন্ধের পর থেকে একের পর এক যা ঘটে গেছে, শরীর তার চাপ নিতে পারছে না। সমস্ত শিরাস্নায়ু ঝিমিয়ে আসছে। এক সময় চোখ বুজে এল তাঁর।

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আচমকা আমিনার আর্ত চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে পাশের ঘরে ছুটলেন সুমিত্রা। জোরালো আলোটা জ্বালতেই চোখে পড়ল, সমানে ছটফট করছে মেয়েটা। যন্ত্রণায় ঠোঁট নীলবর্ণ। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে অনেকখানি। একটানা জোরে শ্বাস টানার কারণে বুকটা ওঠানামা করছে দ্রুত। গলার ভেতর থেকে হিক্কার মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

দৌড়ে খাটের কাছে চলে এলেন সুমিত্রা। তাঁর একটা হাত আঁকড়ে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে কাতর গলায় আমিনা বলতে লাগল, 'মর যায়েগী মা'জি, হাম মর যায়েগী। সিনা ফেটে যাচ্ছে—'

একতলায় আমিনার যে কষ্টটা দেখেছিলেন, এখন সেটা দশ গুণ বেড়ে গেছে। তার গর্ভের বাচ্চাটির পৃথিবীর মাটিতে বেরিয়ে আসার সময় বোধহয় আসন্ন। তখনও সুমিত্রার মনে হয়েছিল, এখনও মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে একজন ডাক্তার ডাকা খুবই জরুরি। চোখ সামনের দেওয়ালের দিকে চলে গেল। ওখানে একটা ওয়াল ক্লক রয়েছে। এখন সেটাতে তিনটে বেজে সাতাশ।

শালিনী হঠাৎ দিল্লি চলে গিয়ে তাঁর সমস্যা কতখানি যে বাড়িয়ে দিয়েছেন! কাছাকাছির মধ্যে আছেন ডাঃ মিসেস আপ্তে। বয়স্ক মহিলা। তিনি সন্ধের পর বাড়ি থেকে বেরোন না। এত রাতে বম্বে শহরের কোনও ডাক্তারই এ-অঞ্চলে আসবে না। যেখানে খুন হচ্ছে মানুষ, রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, লুটপাট চলছে অবাধে, আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বাড়িঘর, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কে আসবে সেখানে?

মেয়েটার যন্ত্রণার উপশম কীভাবে হবে, ভেবে পাচ্ছিলেন না সুমিত্রা। একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন তিনি। হঠাৎ তিরিশ বছর আগের টুকরো টুকরো ক'টি দৃশ্য তাঁর স্মৃতির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

তখন মাধুরী তাঁর পেটে। ন'মাসের পর থেকে মাঝে মাঝেই আমিনার মতো কষ্ট পেতেন। পেটের ভেতর কেউ যেন এলোপাতাড়ি ছুরি চালাতে থাকত। সেই অনুভূতিটা এখনও তিনি ভুলে যাননি। ডাক্তার ব্যথা কমাবার জন্য বরফের মতো ঠাণ্ডা জল পেটে স্পঞ্জ করতে বলেছিলেন। একনাগাড়ে অনেকক্ষণ নয়। মাঝে মাঝে ছেদ দিয়ে দিয়ে। তাতে আরাম বোধ করতেন তিনি।

ছটফটানি ক্রমশ বেড়েই চলেছে আমিনার। সুমিত্রা বললেন, 'এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি। আরেকটু সহ্য কর।' আমিনার মুঠি থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝড়ের গতিতে দোতলায় নেমে ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা বোতল বার করে আমিনার ঘরে চলে এলেন। বাড়িতে স্পঞ্জ নেই। পাতলা তোয়ালে ভাঁজ করে জলে ভিজিয়ে আস্তে আস্তে আমিনার পেটে বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

যন্ত্রণায় আমিনা মাথাটা অনবরত ঝাঁকাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সামলাতে চেষ্টা করছে সে। যখন অসহ্য হয়ে উঠছে, আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ছে।

একটা হাত তার মাথায় রেখে কোমল গলায় সুমিত্রা বলতে লাগলেন, 'কেঁদো না, কেঁদো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।' কোলের কাছে শায়িত অচেনা মুসলমান তরুণীটির দিকে তাকিয়ে বার বার মাধুরীর মুখ মনে পড়ে যাচ্ছিল। তিনি চেয়েছিলেন, গর্ভবতী মেয়ে তাঁর কাছে চলে আসুক। এখানেই তার বাচ্চা হোক। সব মা-ই তা চায়। কিন্তু রাজদীপের ছুটির সমস্যা থাকায় ওরা আসতে পারেনি। সুমিত্রা অনুমান করলেন, সন্তান জন্মের আগে মাধুরীও আমিনার মতো কষ্ট পেয়েছে। মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে আমিনার প্রতি মায়ায় মন ভরে যেতে লাগল তাঁর।

ভোরবেলা ব্যথাটা কমে গেল। ধীরে ধীরে চোখ বুজে এল আমিনার। তার পাশ থেকে নিঃশব্দে উঠে পড়লেন সুমিত্রা। মেয়েটা কিছুক্ষণ ঘুমোক। ঘুমোলে শরীর সুস্থ হয়।

নিজের ঘরে এসে খোলা জানালা দিয়ে সুমিত্রা দেখলেন, আকাশে আবছা আলোর ছোপ ধরেছে। বম্বেতে সকাল হয় দেরিতে। রোদ উঠবে আরও

ঘণ্টাখানেক পর। তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। মাথা টলছিল। কপালের দু'পাশের রগ দুটো দপ দপ করছে। বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে মনে মনে প্রার্থনা করলেন, বাবা সিদ্ধিবিনায়ক গণপতি, বাবা বিষ্ণু, শালিনী দিল্লি থেকে না ফেরা পর্যন্ত আমিনার ব্যথাটা যেন আর না হয়। অন্য ডাক্তার ডাকতে হলে ওর ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, টের পাননি সুমিত্রা। ঘুমটা যখন ভাঙল, রোদে ঘর ভরে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে আমিনার মুখ ভেসে উঠল। পাশের ঘর থেকে কোনও আওয়াজ আসছে কিনা শোনার চেষ্টা করলেন। না, এতটুকু সাড়াশব্দ নেই। অবশ্য কষ্ট হলে চুপচাপ শুয়ে থাকত না আমিনা। চিৎকার করে অনেক আগেই তাঁকে জাগিয়ে দিত।

বিছানা থেকে নেমে একবার পাশের ঘরে এলেন সুমিত্রা। মেয়েটা গাঢ় ঘুমে ডুবে আছে।

সকালে একবার স্নান করা তাঁর বহুকালের অভ্যাস। নিজের ঘরে ফিরে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। তারপর স্নানটান সেরে চলে এলেন নিচের কিচেনে। এই সময় এক কাপ চা না খেলে কোনও কাজেই উৎসাহ পান না। ধূমল আসে ন'টায়। তার আশায় বসে থাকলে অনেক দেরি হয়ে যায়। সকালের এই চা'টা তিনি নিজের হাতেই করে নেন।

গ্যাস জ্বেলে দু'কাপ চা করলেন সুমিত্রা। এক কাপ তাঁর, এক কাপ আমিনার। চা-বিস্কুট নিয়ে ওপরে এসে দেখলেন এর মধ্যে আমিনা জেগে গেছে। তাঁকে দেখে আস্তে আস্তে উঠে বসল সে।

মেয়েটাকে আজ সুস্থ লাগছে। ঘুম তার ক্লান্তি, অস্থিরতা অনেকটাই কাটিয়ে দিয়েছে। তবে চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা লেগেই আছে। তার কারণ অজানা নয় সুমিত্রার। জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন আর ব্যথাটা নেই তো?'

আমিনা মাথা নাড়ল, 'জি, না—'

'যাও, মুখ ধুয়ে এস। চা খাবে—'

বাথরুম থেকে ফিরে এসে নীরবে চায়ের কাপ তুলে নিল আমিনা। বলল, 'আব্বুরা তো এল না মা'জি—'

কাল রাতেই যখন পারেনি, আজ কি জহিরুল তার স্ত্রী এবং ছেলেদের নিয়ে ফিরতে পারবে? ওরা কি কেউ বেঁচে আছে? এই আশঙ্কাটা কাল থেকেই হচ্ছে সুমিত্রার। কিন্তু এসব তো আর পূর্ণগর্ভা মেয়েটিকে বলা যায় না।

কালও বার বার জহিরুলদের কথা জিজ্ঞেস করেছিল আমিনা। সুমিত্রা যা উত্তর দিয়েছিলেন, আজও প্রায় তাই দিলেন। 'আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। হয়ত কোথাও আটকে গেছে। তুমি চা খাও। আমি পরে খাবার নিয়ে আসব।' নিজের কাপটা তুলে নিয়ে পাশের বেড-রুমে চলে গেলেন।

ঠিক ন'টায় ধুমল এসে হাজির। মাঝবয়সী, নিরেট চেহারা। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। আগে মারাঠি ধরনে ধুতি আর হাফ শার্ট পরত। এখন পরে ঢোলা ফুল প্যান্ট। হাফ শার্টটা অবশ্য বজায় রেখেছে। বছর কুড়ি তলোয়ারকরদের বাড়িতে রান্নাবান্না করছে।

তিন-তিনটে তালা খুলে ধুমলকে বাড়িতে ঢোকাতে ঢোকাতে সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের ওদিকের কী অবস্থা?'

ধুমল বলল, 'এমনি কোনও গোলমাল হয়নি। তবে জায়গাটা গরম হয়ে আছে। শুনছি কাল নাকি আমাদের ওদিকের ট্রেন চলবে না।'

সুমিত্রা বললেন, 'যদি চলেও, তুমি দু-তিন দিন এসো না। আমাদের এদিকে দাঙ্গা শুরু হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি পার, রান্নাবান্না করে আজ বাড়ি চলে যাবে।'

'আচ্ছা—' ঘাড় কাত করল ধুমল, 'আমিও শুনেছি, এদিকে খুনখারাপি হচ্ছে। আপনার অসুবিধা হবে, তাই চলে এলাম। পথে খুব ভয় হচ্ছিল।'

এ-বাড়ির কাজের লোকেরা খুবই বিশ্বস্ত এবং অনুগত। নিতান্ত নিরুপায় না হলে তারা কেউ কামাই করে না।

আমিনার চিন্তাটা মাথায় ছিল। সুমিত্রা বললেন, 'একটু বেশি করেই রেঁধো। যাতে দু'দিন চলে যায়।'

ধুমল মাথা নাড়ল।

দোতলায় এসে সুমিত্রা বললেন, 'আমি না ডাকলে তুমি তেতলায় যেও না।'

পারতপক্ষে ওপরে ওঠে না ধুমল। ক্বচিৎ কখনও গেলেও সুমিত্রারা আপত্তি করেননি। কিন্তু আজ হঠাৎ এই বিধিনিষেধ কেন? স্পষ্ট করে কেনই বা জানিয়ে দেওয়া হল? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সে বেশ অবাক হল। তবে কোনও প্রশ্ন করল না।

সুমিত্রা তেতলায় উঠে আমিনার কাছে গেলেন। বললেন, 'আমাদের কাজের লোক এসে গেছে। তুমি ঘর থেকে একদম বেরোবে না। কোনও রকম শব্দও করবে না। বুঝতেই পারছ, তোমার কথা ও জানতে পারলে ভীষণ মুশকিল হবে। মনে থাকবে?'

'হ্যাঁ—' আবছা গলায় বলল আমিনা।

সুমিত্রা বাইরে বেরিয়ে দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিলেন।

ধুমল রান্নাবান্না চুকিয়ে সাড়ে এগারোটায় চলে গেল। এর মধ্যে হিতাকাঙ্ক্ষীদের প্রচুর ফোন এসেছে। সেই একই বক্তব্য। সবাই সুমিত্রাকে নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে চায়, কিংবা তারাই এ-বাড়িতে এসে পাহারা দিতে চাইছে। অন্য দিনের মতো

ধন্যবাদ জানিয়ে সুমিত্রা বললেন, তেমন প্রয়োজন হলে তিনিই যোগাযোগ করবেন।

দাঙ্গা থামার লক্ষণ নেই। মাঝে মাঝেই হল্লার শব্দ ভেসে আসছে। হানাদারেরা দঙ্গল বেঁধে ছুটে যাচ্ছে উত্তরে, পুবে, দক্ষিণে। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই হয়। হাইওয়ে দিয়ে আগের ক'দিনের মতো দু-চারটে গাড়ি তাড়া-খাওয়া ভীরু জন্তুর মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে। ক্বচিৎ কালো রঙের পুলিস ভ্যান চকিতে দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

একটা নাগাদ আমিনাকে খাইয়ে নিজেও খেয়ে নিলেন সুমিত্রা। আজ আর ছোঁয়াছুয়ির ব্যাপারটা তাঁর মাথায় নেই। সময় যত কাটছে, টেনশনও পাল্লা দিয়ে ততই বাড়তে থাকে। শালিনী যদি কোনও কারণে আজ বম্বেতে ফিরতে না পারেন? যদি আরও দু-চার দিন দিল্লি থেকে যান?

দিল্লি থেকে বম্বেতে অনেকগুলো ফ্লাইট আছে। কোন ফ্লাইটে আসবেন শালিনী? কখন?

একটাই মাত্র সুলক্ষণ। আজ, এখন পর্যন্ত ব্যথাটা আর হয়নি আমিনার। কিন্তু গর্ভযন্ত্রণা বলে কথা। কখন যে সেটা চাড়া দিয়ে উঠবে আগে থেকে হদিস পাওয়া যায় না।

সুমিত্রা একবার ভাবলেন, শালিনীর ফ্ল্যাটে ফোন করবেন কি না। পরক্ষণে মনে পড়ল, রেণুকে তো বলাই আছে। ফিরে এলে এতক্ষণে শালিনী তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই যোগাযোগ করত।

সাড়ে তিনটে নাগাদ ফের যন্ত্রণা শুরু হল আমিনার। উদ্বিগ্ন, চিন্তাগ্রস্ত সুমিত্রা কালকের মতো আবার যখন ঠাণ্ডা জল স্পঞ্জ করতে যাবেন, শালিনীর ফোন এল।

'এইমাত্র আমি দিল্লি থেকে ফিরেছি। রেণু বলল, এলেই যেন তোকে ফোন করি। বিশেষ দরকার। কী হয়েছে রে?'

বিস্তারিত সব জানালেন সুমিত্রা।

শালিনী ব্যস্তভাবে বললেন, 'মেয়েটাকে বাড়িতে রাখা ঠিক হবে না। যে কোনও সময় ডেলিভারি হতে পারে। তুই ভীষণ অসুবিধায় পড়ে যাবি। আমি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এক্ষুনি আসছি।'

চল্লিশ মিনিটের মধ্যে চলে এলেন শালিনী। শুধু অ্যাম্বুলেন্সই নয় স্ট্রেচারবাহক এবং একজন নার্সও সঙ্গে করে এনেছেন।

আমিন ব্যাকুলভাবে সুমিত্রাকে বলল, 'আমি আপনার কাছ থেকে যাব না। কিছুতেই না।'

আমিনার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে শালিনীকে দেখিয়ে সুমিত্রাকে বলেন, 'কোনও ভয় নেই। উনি আমার বন্ধু। একজন বড় ডাক্তার। আমার মতোই তোমার

আরেকজন মা। ওঁর সঙ্গে গেলে তোমার ভাল হবে। যাও—' গলার স্বর আবেগে বুজে এল তাঁর।

আমিনাকে স্ট্রেচারে শুইয়ে বাহকেরা নিচে নামিয়ে নিয়ে গেল। আর পিছু পিছু গেলেন সুমিত্রা, শালিনী আর নার্সটি।

সুমিত্রা বললেন, 'বাচ্চা হলেই আমাকে খবর দিস।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমার মনে হয়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খবর পাবি। সময় হয়ে এসেছে।'

সবাই রাস্তায় চলে এসেছিল। অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর তখন আমিনাকে ঢোকানো হচ্ছে, সুমিত্রার একটা হাত আঁকড়ে ধরে সে ভাঙা গলায় বলল, 'মা'জি, আব্বুরা ফিরে এলে—' শেষ না করেই সে থেমে গেল।

সুমিত্রা বললেন, 'ওরা এলেই তোমার কাছে নিয়ে যাব।'

অ্যাম্বুলেন্স চলে যাওয়ার পর বাড়ির ভেতরে এসে গেটে তালা লাগাতে লাগাতে হঠাৎ সুমিত্রার চোখ কাছের এবং দূরের উঁচু উঁচু বাড়ি গুলোর দিকে চলে যায়। প্রায় প্রতিটি বাড়ির নানা ফ্ল্যাটের জানালায় বেশ কিছু কৌতূহলী মুখ নিশ্চয়ই ওরা আমিনার কথা পরে জানতে চাইবে। এই মেয়েটি কীভাবে তাঁর বাড়িতে এল, তাঁর সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক, কেন তাকে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে পাঠাতে হল, ইত্যাদি।

ভেতরে ভেতরে সামান্য থমকে গেলেন সুমিত্রা। তারপর মনস্থির করে ফেললেন, যা সত্যি তা-ই বলবেন। এতে যা হওয়ার হবে। যে কোনও পরিণতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখবেন তিনি।

রাত সোয়া আটটায় শালিনী জানালেন, 'সুখবর। আমিনার একটি ছেলে হয়েছে। একেবারে নর্মাল ডেলিভারি।'

জহিরুল সেই যে কাল চলে গিয়েছিল, আর ফেরেনি। সুমিত্রা নিশ্চিত, সে কোনও দিনই ফিরবে না।

উনিশ-কুড়ি বছরের পরিজনহীন নির্বান্ধব একটি মেয়ে তার প্রথম শিশুর জন্ম দিয়েছে। ভারতবর্ষে কী ভবিষ্যৎ ওদের? সুমিত্রার মনে হল, সঙ্কট থেকে তাঁর মুক্তি নেই। আমিনাদের সম্পর্কে তাঁকে নতুন করে ভাবতে হবে।

—